

1.....

দৃশ্য

লেখা: তানিম জাবের

এখানে হিমরাত পুড়ছে বালিরেণু  
তথাপি দূরে কেউ কুয়াশা ছলকায়,  
ব্যথার আদরে এতটা নুন ছিল  
অম্মুম কারাবাসে, তবু ঘুম পায়।  
যতটা নিয়ত, ততটা দেওয়া হলে  
প্রাচীরে শৈবাল-অ্যামিবা কথা কয়,  
নদীর কাছ থেকে বিরহ নেওয়া শেষে  
সাগরে গিয়ে বালু-ঝিনুকে প্রেম হয়!  
অন্ধকার কারা গেঁথেছে গোপনে  
বিষের পাশে শুয়ে নীরবে একা একা,  
ঝিনুক ফলে গেলে সাগর মরণে  
খোলসের আবরণে মুক্তা ছিল লেখা।  
এহেন দৃশ্যের পাশেতে শুয়ে শুয়ে  
টুকরো তারাভাঙা বরছে—তা-ই দেখা।

2.....

শ্রান্ত মাধুরী

লেখা: তানভীর মাহমুদ

রাখো দৃশ্যের মুখোমুখি প্রতিফলক।  
আড়াল ঝরানো পারদের চোখ থেকে  
আবৃত হওয়া ডাক পেল প্রশ্ন রাখে—  
হব নাকি পার?  
গহ্বর ঘিরে রাখে অযুত প্রস্তর।  
মাতাল রোদের স্পর্শে চনমনে বালুর  
গান থেকে মরু-পর্বতের সারিতে  
নেমেছে শ্রান্ত মাধুরী। জুঁইয়ের  
আলুথালু ঘ্রাণ বেয়ে গড়ানো  
সময়ের এলানো শিয়রে  
ঠাই পেল অনন্ত অলোক।

3.....

চুষন

লেখা: টি এম কায়সার

জ্যোতিষী বলেছে—

হাসপাতালে রোগযন্ত্রণায় নয়

আমার মৃত্যু বরণ হবে সাঁড়াশি চুষনে; নেশাতুর ওষ্ঠ-অভিসারে

এক জমকালো সন্ধ্যায় আমাদের দেখা হবে

অর্থাৎ

আমি ও আমার যম—চতুর্দিকে নিস্তন্ধ নগরী

প্রতিটি চুষনের আগেই তাই সযত্নে গ্রহণ করি মৃত্যুপ্রস্তুতি

ও সুবল রে...

এরে কি চুষন বলে, ক্ষণে ক্ষণে মৃত্যু যেথা যথা উহ্য নাই?

4.....

কালিকট

লেখা: রনক জামান

হাওয়ায় কাঁপছে রৌদ্র—সবুজ না হলুদাভ মালাবার, নারকেলগাছের সবুজ।

ওরা আসে, দূর দ্বীপপুঞ্জের বাণিজ্য জাহাজ।

আসে মসলাভর্তি।

আসে জায়ফল, দারুচিনি,

লবঙ্গ ও বণিকের হঠাৎ বিপন্ন চোখ তল্লাশে কঙ্কাল খুলির নিশান

মধ্যসাগরে, কুজ্জাটিকার আড়ালে

কোথাও কি দুরবিনে চমকাল রোদ? বারুদের গাদায় বসে ভাস্কো দা গামা?

বণিকেরা মন্ত্র জপে, মনে মনে।

তবু শুনে নিতে পারে তারা পরস্পরের মন্ত্র:

যেন তারা সৌরতাপে উবে বাষ্পীভূত হয়ে যাবে,

যেন তারা জাহাজসমেত মেঘে মিলিয়ে যাবে—

তারা অপেক্ষা করে

5.....

মার্কারি

লেখা: জাহিদ সোহাগ

আয়নার পারদ উঠে গেছে, ও এখন কেবল কাচ; যেন সকালে গোসলভেজা শরীর, অফিসে যাবার

আগে শশব্যস্ত, নগ্ন, পরে নিচ্ছে জামাকাপড়; জানি, গ্রিবা ও তারও নিচে ছড়িয়ে থাকা যত পাখি ও  
পক্ষিবিশারদ, তাদের চোখে গ্লাস-বরফের জল;  
যদি মুখাগ্নির আগুন জ্বলেও ওঠে ঠোঁটে, একঝামটায় নিভিয়ে দেবে সকল উদ্যোগ;

6.....

শীতভ্রষ্ট

লেখা: তুষার কবির

এ শীতে কুয়াশা চিরে আমি হেঁটে যাই  
কুহক ছড়ানো পথে!  
দেখি শীতঘোর রাতে  
যারা বের হয়  
মধুবালা অপেরা হাউস থেকে;  
শিস কেটে হেঁটে যায়  
কুয়াশা মোড়ানো আলপথ ধরে—  
তারা সব হারিয়ে ফেলেছে  
শীতভেজা রঙিন টিকিট!  
হামদহ গ্রামে যে কবি হেঁটে যায়  
হারিকেন নিভে যাওয়া জোনাক আলোতে—  
দূর থেকে ভেসে আসা  
টিয়াডাক ভোরে  
তার দুহাতে জড়ানো দেখি  
শীতঘুম রতির পালক!  
এ শীতে পুরোনো জংশন পার হয়ে  
আমি হেঁটে যাই;  
ধোঁয়া ওঠা চায়ের টংঘর  
ছড়ানো খড়ের গাদা আর  
শীতলাগা মেথরপাড়ার পাশ ঘেঁষে হেঁটে যাই—  
কড়া নাড়ি মাঝরাতে  
শীতমগ্ন দেবীর ডেরায়!

7.....

বাজার

মোস্তাক আহমাদ দীন

এই চিত্র চিত্র নয়, এই দৃশ্য দৃশ্য কিছু নয়,

পাত্রে পাত্রে বিচিত্র পসার  
এ বাজারে আজকাল, সরাসরি বর্গিরাও আসে!  
বহু রং কোর্তা পরে রঙে রঙে সেজেছে দোকানি  
দৃশ্যে দৃশ্যে তারা দুখী, মনে মনে খুশি  
তারা চুনের বদলে ধান, তারা পানের বদলে কেনে শাড়ি  
জঙ্গলের প্রতি যত জঙ্গবাজ কিশোরেরা যায়  
মাঝে মাঝে চণ্ডশক্তি ধার করে আনি  
পরিবর্ত-চিন্তা এলে মনে মনে এই সব জাগে  
এ বাজারে বর্গিরাও দাঁত খুলে হাসে

8.....

প্রেমের কবিতা ২০২৪  
রুদ্র আরিফ

আমাদের চোখ এসে ঢেকে দিচ্ছে প্রজাপতি একদল:  
বিষণ্ন সন্ধ্যায়, বুকশপে এভাবেই চুমু ও চাবুক—  
উঠছে জেগে—সহস্রাব্দ পেরোনো লাল অক্ষরের শোক  
কাটিয়ে পাশ, শহুরে হাওয়া ও ধুলায় করছে খলবল  
খুচরা পয়সার মতো তোমাকে ছিটিয়েছি যতবার  
শহরজুড়ে গজিয়েছে তত জুঁই ফুল গাছ—আহা! আর—  
কাছিমের পিঠ হয়ে উবু শুয়ে থাকা নীল ফ্লাইওভার:  
তাতে বেদনা নিরবধি সেজে অন্ধ রেসিং কার  
উড়িয়েছে শূন্য ঘরে ও বাইরে প্রবল হাহাকার;  
আমাদের চোখ ঢেকে দিয়ে গেছে প্রবোধের নীল পাহাড়  
পাহাড় বলতেই আড়মোড়া দাও তুমি, চিরহরিৎ মাতা:  
পরধীনতার গল্প জানো কি? বিমূর্ত ভায়োলিন!  
ক্রন্দনময় পর্বত প্রান্তর আমাদের নিজস্ব ফিলিস্তিন:  
বুলেট রচিত প্রেমকাব্যে বিজ্ঞাপনী স্বাধীনতা

9.....

উইন্টার সং  
জাফর আহমদ রাশেদ

যখন এমন শীতরাত আসে, চরাচর স্তব্ধ হয়ে যায়। হঠাৎ কয়েকটি পাতার মর্মর ছড়িয়ে পড়ে  
বহুদূর। আজ সে রকম শীত। কোথাও কোনো শব্দ নেই বলে এত দূর থেকে ঘুমে ঘুমে আপনার  
পাশফেরা শোনা গেল। দীর্ঘ গজারিবন আর কুয়াশার রেণু বেয়ে কানে এল শাড়ির খসখস।

আমি বসে আছি আমার পোষা একমাত্র টিকটিকিটির দিকে তাকিয়ে। রাতভর খাবারের সন্ধানে ছুটল সে, দাঁড়াল, দেয়ালে শুয়ে থাকল মড়ার ভান করে। কিন্তু একবারও বলল না—টিকটিক...।

10.....

এই রাতে

লেখা: ফিরোজ এহতেশাম

কুয়াশায় সমাহিত চরাচর  
শীতের গভীর কোনো রাত্রে  
হাতে ধরা কোথাকার উলুখড়  
এসেছি দিগ্বিদিক হাতড়ে  
বাঁশঝাড়, ধানখেত পেরিয়ে  
হাতে-পায়ে কাদামাখা, ক্লান্ত  
আঁধারের চোরাফাঁদ এড়িয়ে  
যেতে হবে, ডাকে ওই প্রান্ত  
যেন এক পলাতক আসামি  
বহুদিন পরে এল পাড়াতে  
এ বাড়ি কি তার বাড়ি? আয়েশা  
দরজাটা খুলে যদি দাঁড়াতে  
কিন্তু কোথাও কোনো সাড়া নাই  
নিঃসাড় পড়ে আছে চারিধার  
তাহলে কি ফিরে যাব? ফিরে যাই  
এই রাতে আমি কার, কে তোমার...

11.....

বিতর্কিত বিজ্ঞাপন

লেখা: মোহাম্মদ আসাফুউদ্দৌলাহ্

এখন তো শ্বাস নেওয়াটাও শাস্তি মনে হচ্ছে;  
তাহলে কি মিছিলে আবার যাব একবার আরও—  
এই ধূসরাভ দ্রাঘিষ্ঠ সময়?  
এই বিদায়-সন্ধ্যায়, এই বিবশ অক্ষমতার দিনে,  
এই পায়ে-পায়ে উদাস জড়তার বয়সে?  
আমার মতো অন্য যারা ডায়াবেটিস আর ইনসুলিনের  
দ্বৈরথে দুর্গত, তারাও আজ যেতে চায় মিছিলে।  
যা কিছু ছিল একদা আমাদের গর্বের ধন, তা সব

লুট হয়ে গেছে আমাদের আলস্যকালে। লুট করে  
নিয়ে গেছে বহুদূরে, অন্য এক শত্রু শহরে। তালার চাবি  
আর হত্যার খঞ্জর আমরাই নাকি তুলে দিয়েছি  
পুরাতন ঘাতকের হাতে।  
চিঠি একটা এসেছিল লাল এক রক্তিম খামে  
সীমান্ত-তারে ঝুলে থাকা ধ্বংস ফেলানীর নামে।  
শ্রবস্তী নদীর মতো নাম তার ভুলে গেছে লোকে;  
এখন সে ঘাসে আকীর্ণ গঞ্জের নিচু জমি ছাড়া  
আর কিছু নয়।

12.....

যে কারনে এখন থেকে আর কবিতা প্রকাশ করবেন না জয় গোস্বামী  
Text not found

যদি আর পাঁচ-সাত বছর বেঁচে থাকেন, তখন ভেবে দেখবেন, কবিতা প্রকাশ করবেন কি করবেন না।

কবিতায় একদা তিনি লিখেছিলেন, ‘এক পৃথিবী লিখব বলে একটি খাতাও শেষ করিনি!’  
পশ্চিমবঙ্গের সেই জনপ্রিয় কবি জয় গোস্বামী এবার দিলেন এক বিস্ময়কর ঘোষণা, এখন থেকে  
আর কবিতা প্রকাশ করবেন না তিনি। সম্প্রতি নিজের কবিতা প্রকাশের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে  
প্রকাশিত কবিতা প্রকাশের ৫০ বছরে নামের এক পুস্তিকায় দীর্ঘ একটি লেখার মাধ্যমে জয়  
গোস্বামী এ ঘোষণা দিয়েছেন। তবে কবিতা প্রকাশ না করলেও কবিতা লেখা থেকে অবসর নিচ্ছেন  
না এই খ্যাতিমান কবি। জয় গোস্বামী জানিয়েছেন, এখন থেকে তিনি নীরবে-নিভূতে লিখে যাবেন।  
যদি আর পাঁচ-সাত বছর বেঁচে থাকেন, তখন ভেবে দেখবেন, কবিতা প্রকাশ করবেন কি করবেন না।

কবিতা প্রকাশের ৫০ বছরে পুস্তিকায় জয় গোস্বামী লিখেছেন: ‘আমার ৫০ বছর কবিতা প্রকাশের  
পূর্তি আমি আমার রচনা প্রকাশ বন্ধ করে দিয়েই উদ্‌যাপন করতে চাই। যেসব সম্পাদক আমার  
লেখা সম্মান দিয়ে এত বছর প্রকাশ করে এসেছেন, তাঁদের কাছে আমার আভূমি-নত কৃতজ্ঞতা  
অর্পণ করি। পাশাপাশি আমার কাছে আর লেখা চেয়ে চিঠি না দেওয়ার অথবা ফোন না করার  
জন্যও মিনতি জানাই। তাঁদের “না” বলতে আমার দুঃখ হবে, অথচ “না” তো বলতেই হবে আমার  
আত্মপরীক্ষার জন্য। তাঁরা যে আমাকে দুঃখ দিতে চান না, এ-কথা আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি!’  
নিজের এ সিদ্ধান্তকে জয় গোস্বামী ‘আত্মপরীক্ষা’ বলে উল্লেখ করে এখন থেকে কেউ যেন পুরস্কার  
দেওয়ার জন্য তাঁর নাম বিবেচনা না করেন, এমন অনুরোধও করেছেন।

জয় গোস্বামী দুবার আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন। ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত বঙ্গবিদ্যুৎ-ভর্তি খাতা  
কাব্যগ্রন্থের জন্য তিনি পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি পুরস্কার পান। এ ছাড়া বঙ্গভূষণ, বঙ্গবিভূষণ,  
সাম্মানিক ডি লিটও লাভ করেছেন দুই বাংলার জনপ্রিয় এই কবি।

গেল ২৫ ডিসেম্বর বড়দিনের সময় কবিতা প্রকাশের ৫০ বছরে শিরোনামের পুস্তিকাটি প্রকাশিত  
হয়েছে। বিনা মূল্যে পুস্তিকাটি পাওয়া যাচ্ছে কলকাতার বিভিন্ন বইয়ের দোকানে। সেই পুস্তিকায়

জয় গোস্বামী আরও লিখেছেন, ‘একটি কবিতার পেছনে সর্বোচ্চ পরিশ্রম প্রয়োগ করার সময় লেখাটি কবে ছাপা হয়ে বেরোবে, এই বাসনাকে বিচ্ছিন্ন করা। যেকোনো বাসনার মধ্যেই একরকম উত্তেজনা থাকে। লেখার উত্তেজনাটি জাগ্রত রইল। ছাপার বাসনা তথা উত্তেজনা নির্বাপিত হলো সম্পূর্ণ। তা কি সম্ভব আমার পক্ষে? এই বয়সেও যদি তা সম্ভব না হয়, তবে তা কবে হবে?...এই পথই আমার সামনে পড়ে রয়েছে একমাত্র পথ হিসেবে। নিজের সম্পর্কে মমত্ব বর্জন করার এই এক উপায়। এ কেবল এক আত্মপরীক্ষা চালানো। এক আধ্যাত্মিক অনুশীলন।’

সম্প্রতি ৭০ বছরে পা রেখেছেন জয় গোস্বামী। ৭০ বছর বয়সে পৌঁছে কেন আর কবিতা প্রকাশ করবেন না এই কবি? তার ব্যাখ্যাও তিনি দিয়েছেন পুস্তিকায়। বলেছেন, ‘৫০ বছর ধরে আমার কবিতা ছাপা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু কবিতা লেখা কি আমি শিখতে পেরেছি? নিজের কাছে কারচুপি করব না এই বয়সে। স্বীকার করে নেব—না, কবিতা কী করে লিখতে হয় আমি আজও শিখিনি। মুদ্রণ-উপযোগী কিছু লাইন “কবিতা”র নামে ছাপিয়েছি শুধু।’ নিজের কবিতা সম্পর্কে এমন মন্তব্যের পর জয় গোস্বামী বলেন, এবার তিনি নিজের কাব্যভাষা খোঁজার চেষ্টা করবেন। তাই নিজেকে খোঁজার জন্য, নিজস্ব নিভৃতিতে বসে কাব্যরচনার প্রয়াস নেওয়ার সময় এখন তাঁর। লেখা প্রকাশের বাসনা থেকে নিবৃত্তি নিয়ে শুধু লেখার উত্তেজনাকে জাগিয়ে রাখা সম্ভব কি না, সেই নিরীক্ষায় তিনি প্রবেশ করতে চান।

চারদিকে যখন আত্মপ্রকাশের উৎসব, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম তথা ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব, টিকটক আর ইনস্টাগ্রাম যখন হরদম উসকানি দিচ্ছে প্রকাশ্য হওয়ার, ঠিক তখনই প্রকাশের জগৎ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিলেন জয় গোস্বামী।

সূত্র: হিন্দুস্তান টাইমস ও আনন্দবাজার পত্রিকা

গ্রন্থনা: অন্য আলো প্রতিবেদক

13.....

কুয়াশার কফিন

লেখা: জারিফ আলম

কখনো কখনো ধূসর কোনো ছবিতেই থাকে  
না দেখবার কারসাজি। আড়ালে আবড়ালে  
ব্যথা পুষতে গিয়ে পোষ মেনে যায় কারও কারও।  
অমলিন জ্যোৎস্নায় উৎসুক অতীত নিয়ে তাই  
রাতের কানাকানি থেকে যায় অবশেষে।  
দৈবাৎ কোনো পদাবলি এসে যদি টোকা দেয়  
বন্ধ দরজায়, যদি কোনো অন্ধ হোমার তুলে নেয়  
কাহিনি রচনার ভার; তাতে আমারও থাকে কিছু দায়।  
ভেলকিবাজির মতো ঘটে না কিছু নিত্য যাপনে  
মিথ্যে সংলাপে বকে যাওয়ার মতো সময় এখন।  
শেষ পর্যন্ত দেখা হয় না কিছু ভুলের মহড়া ছাড়া;  
কিছুটা অন্ধকারে ঢেকে যায় কিছুটা কুয়াশার কফিনে।

14.....

অ্যাড্রেস

লেখা: মুশফেকা ইসলাম

পাতলা চারতলা বাড়িটায়

ষাদের ঘর ছিল—

মানে দুইটা কামরা

বিছানা, একটা খাবার টেবিল

ইতস্তত কিছু সোফা, ফ্রিজ, এটা-সেটা...

ঘর হতে যা লাগে আরকি!

তবু তো ঘর পাল্টায়,

বদলায় ঘর;

ঘরের মানুষেরা কেউ থাকে,

কেউবা থাকে না কোথাও আর,

চলে যায় দূর কোথাও, বহুদূরে...

দূরে যাওয়ার সময় বাবা-মাকে

এমন বুড়ো-বুড়ো লাগে কেন!

15.....

কান্না

লেখা: মোহাম্মদ দুলাহান

যে সকল রাত মা অনেক যত্ন করে লুকিয়ে রাখেন

তার থেকে কিছু রাত চুরি করে বেড়ে উঠছি

আমাদের নেভি ব্লু বয়স লুকিয়ে রাখছি

একটা অত্যাশ্চর্য নিমগাছের কাছে;

ঝিনাইয়ের থেকেও বেশি পানি আমাদের চোখে

মা একটা দুঃখিত ব্যাংক

সেকেন্ড সেকেন্ড চোখের পানি জমা রাখছি

মায়ের চোখে

হাত মেলে, পাখা মেলে পাখিদের স্বপ্নে

আমাদের অবাধ আনাগোনা

চোখ মেলতে পারি না কোনোভাবেই

বিধ্বস্ত বুকটা মেলতে পারি না

বুকটাতে যে একটা সবুজ শিশু ঘুমিয়ে আছে—



উন্মুক্ত করে দেখাতে পারি না তোমাদের  
রাতটাকে লিখে রাখছি মায়ের কুসুমিত কান্নায়।

16.....

আপনি ও আমি

লেখা: নাজিয়া আফরিন

কোনো কোনো দিন

আপনাকে চিনি না,

বলতে ইচ্ছা হয়

আপনি আসলে কে?

বলতে ইচ্ছা হয়

আপনার ভেতরে

আমার যে ছায়া

রাখা আছে

সেটা কোথায়?

তাসেরও ছায়া পড়ে,

দোভাষি দিনটা তখন

ভুলে যায় বলতে

কী ছিল কথার দাম...

ছায়া বন্ধক রেখে

আমি চলে যাই

17.....

চন্দ্রবিন্দু

লেখা: তারিক সালমন

এর নাম মুক্তি, যদি তুমি বুঝে নিতে পারো

**সন্দেহ** হয় যদি কালকেই আসব আবারও

নতুনের মতো রোজ, কখনো হও না পুরোনো যে

একবার (চোখ মেলে) দেখে যদি কেউ, মনে মনে

তোমাকেই খোঁজে

বিকেলের কার্নিশে ঝুলে আছে রোদটুকু (প্রায়শই

এ রকম হয়), গলি থেকে বের হয়ে দাঁড়িয়েছে

সড়কের নম্বর ৯

রাস্তায়, রিকশায়, পোস্টারে, আলোয়, আঁধারে

ফুটপাতে ডুবে যাই ক্ষুদ্র এ হৃদয়ের ভাৱে  
ঝিঁঝিঁঝিঁ বাতাসেৰ ৰাতে তাৰাগুলো সন্ধ্যাপ্ৰদীপ  
তুমি আৰ কিছু নও, সোনা, তুমি শুধু (ছোট) লাল টিপ  
আৰ কিছু নও তুমি, চন্দ্ৰেৰ তুমি এক ফোঁটা  
আমি লিখি বলে (আৰ কাউকেই লিখতে দেব না  
বিবৰণ তোমাৰ পুৰোটা)

18.....

ৰক্তাক্ত প্ৰান্তৰে  
শামসুৰ ৰাহমান

বন্দী শিবিৰ থেকে কাব্যগ্ৰন্থেৰ বেশিৰ ভাগ কবিতা শামসুৰ ৰাহমান লিখেছিলেন মুক্তিযুদ্ধেৰ সময়।  
মজলুৰ আদিব ছদ্মনামে তাঁৰ কবিতাগুলো সে সময় ছাপা হয়েছিল কলকাতাৰ দেশ পত্ৰিকায়।  
এখন চৰে না ট্যাংক ভাটপাড়া, ভাৰ্সিটি পাড়ায়  
দাগে না কামান কেউ লক্ষ্য কৰে ছাত্ৰাবাস আৰ।  
এখন বন্দুক  
জানালাৰ ভেতৰে হঠাৎ  
দেয় না বাড়িয়ে গলা অন্ধকাৰে জীবনানন্দীয়  
উটেৰ মতন। ফৌজি ট্ৰাক কিংবা জিপ  
ৰাস্তায় রাস্তায়  
পাগলা কুকুৰেৰ মতো দেয় না চক্কৰ। এখন তো  
হেলমেটকে মানুষেৰ মস্তকেৰ চেয়ে  
বেশি মূল্যবান বলে ভুলেও ভাবি না।  
এখন বিজয়ানন্দে হাসছে আমাৰ বাংলাদেশ  
লাল চেলি গায়ে, কী উদ্দাম। গমগমে  
ৰাস্তাগুলো সারাক্ষণ উজ্জ্বল বুদ্ধবুদ্ধময়। শুধু আপনাকে,  
হ্যাঁ, আপনাকে মুনীৰ ভাই,  
ডাইনে অথবা বাঁয়ে, কোথাও পাচ্ছি না খুঁজে আজ।  
আপনাৰ গলাৰ চিহ্নিত স্বৰ কেন  
এ শহৰে প্ৰকাশ্য উৎসবে  
শুনতে পাব না আৰ? সেই চেনা স্বৰ? ঝৰা পাতাৰ ওপৰ  
খৰগোশেৰ মৃদু পদশব্দেৰ মতন?  
আপনাৰ মতো আৰও কতিপয় মুখ  
চেনা মুখ আৰ  
এখানে যাবে না দেখা, যাবে না কথখনো।  
মনে পড়ে, জুনে জলে-ঘোলা পচা ডিমের বিশদ  
কুসুমের মতো এক ঘোলাটে বিকেলে

এই শত্রুপ্লাবিত শহরে হলো দেখা  
আপনার সঙ্গে পথপার্শ্বে। দেখলাম,  
আপনি যেন বা সেই জলচর পাখি,  
ডাঙ্গায় চলতে গিয়ে ব্যর্থ,  
হেঁচটে হেঁচটে  
বিষম ক্ষতবিক্ষত, পরাজিত, দারুণ নিষ্প্রভ।  
আমাদের সবার জীবনে  
নেমেছে অকালসন্ধ্যা, হয়েছিল মনে,  
আপনার চোখে চোখ রেখে।  
তখন সে চোখে কবরের পরগাছার কী কর্কশ  
বিষণ তা আর হানাবাড়ির আঁধার  
লেপ্টে ছিল, বারুদের গন্ধ ছিল সত্তায় ছড়ানো।  
'এই যে, কেমন আছ শামসুর রাহমান, তুমি?  
খবর আছে কি কিছু?'—যেন আপনারই ছায়া কোনো  
করল প্রশ্ন রক্তাক্ত প্রান্তরে। অসামান্য  
বাগ্মীও কেমন আর্ত হন, হায়, বাক্যের দুর্ভিক্ষে,  
বুঝেছি সেদিন।  
আপনার চোখে বুঝি ফুটেছে অজস্র বনফুল,  
নেমেছে জ্যোৎস্নার ঢল মুখের গহ্বরে, প্রজাপতি  
পেলব আসন পাতে বৃষ্টি ধোয়া ললাটের মাঠে,  
আপনাকে ঘিরে দৈনন্দিন  
ঘাস আর পোকামাকড়ের গেরস্থালি।  
আপনি মুনীর ভাই কুকুর কি শেয়ালের পায়ের ছাপের  
অন্তরালে ঢাকা পড়ে থাকবেন, হায়,  
কী করে আপস করি এমন ভীষণ অত্যাচারী  
ভাবনার সাথে?  
বলুন মুনীর ভাই, আপনি কি আগাছার কেউ?  
আপনি কি ক্রীড়াপরায়ণ প্রজাপতিটার কেউ?  
আপনি কি শেয়ালের? কুকুরের? ঘাসের? পিঁপড়ের?  
শকুনের? আপনি কি ক্রুর ঘাতকের?  
শুনুন মুনীর ভাই, আপনার বারান্দার নিভৃত বাগান  
কেমন উদ্গ্রীব হয়ে আছে গৃহস্বামীর প্রকৃত  
শুশ্রূষার লোভে আজও। একটি বিশুদ্ধ ঠোঁট বৈধব্যের ঘাটে  
জেগে থাকে আপনার উষ্ণ চুষনের প্রতীক্ষায়,  
একটি টাইপরাইটার আপনার একান্ত স্পর্শের জন্যে  
নিরুন্ম নীরব হয়ে থাকে। ফের কবে  
পাতা উল্টাবেন বলে সকালে দুপুরে মধ্যরাতে  
পথ চেয়ে থাকে শেল্ফময় গ্রন্থাবলি

আপনার পদধ্বনি আবার শুনবে বলে ঐ তো  
এখনো ফ্ল্যাটের সিঁড়ি কান পেতে রয় সারাঞ্চল। কোনো কোনো  
সভাগৃহ আপনার ভাষণের জন্যে আজও কেমন উৎকর্ণ  
হয়ে পড়ে। আপনার অভ্যস্ত ছায়ার জন্যে এখনো পড়ে না  
দর্পণের চোখের পলক।

‘আছে কি খবর কিছু?’—আপনার ব্যাকুল জিজ্ঞাসা  
সাঁতরে বেড়ায় আজও আমার মগজে ক্ষান্তিহীন।  
কেলিপরায়াণ  
মাছের মতন কোনো সংবাদের লেজ ধরে সেদিন বিকেলে  
রক্তাক্ত প্রান্তরে  
আপনাকে পারিনি দেখাতে।

অথচ এখন নানারঙা পাখি হয়ে ডেকে যায়  
খবরের ঝাঁক ইতস্তত। শুনুন মুনীর ভাই  
কালো জঙ্গি পায়ের তলায় চাপা পড়া  
আপনার ‘বাংলাদেশ লক্ষ লক্ষ বুটের চেয়েও  
বহু ক্রোশ বড়ো বলে বর্গীরা উধাও।’ বহুদিন  
পরে আজ আমাদের মাতৃভূমি হয়েছে স্বদেশ,  
ইত্যাদি ইত্যাদি  
খবর শুনুন।

শুনুন মুনীর ভাই, খবর শুনুন বলে আজ  
ছুটে যাই দিগ্বিদিক, কিন্তু কই কোথাও দেখি না আপনাকে।  
খুঁজছি ডাইনে বাঁয়ে, তন্ন তন্ন, সবদিকে, ডাকি  
প্রাণপণে বারবার। কোথাও আপনি নেই আর।  
আপনি নিজেই আজ কী দুঃসহ বিষণ্ণ সংবাদ।

...

সূত্র: বন্দী শিবির থেকে, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ১৯৭২, প্রকাশক: অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা

19.....

মুক্তিযুদ্ধের সময় যে কবিতা ছাপা হয়নি  
বাশার খান সংগ্রহ ও ভূমিকা

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে বাঙালিদের ওপর গণহত্যা শুরু করেছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী।  
পরদিন ২৬ মার্চ ৭৭ নম্বর সামরিক আইনবিধিতে গণমাধ্যমের ওপর প্রেস সেন্সরশিপ আরোপ  
করে পাকিস্তানি সামরিক শাসকচক্র। যার মোদাকথা হলো, সরকারিভাবে নিযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে  
আগে পেশ না করে এবং কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র ছাড়া জাস্তা সরকারের বিরুদ্ধে যায়, এমন কোনো  
বিষয় প্রকাশ করা যাবে না। তাই অবরুদ্ধ বাংলায় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে লেখালেখি সহজ ছিল না।  
তবে সেই কঠিন দুঃসময়ে কেউ কেউ লেখার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ঢাকা থেকে প্রকাশিত

সংবাদপত্রে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে লেখা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ, অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব ছিল। ফলে মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশের সপক্ষে পত্রপত্রিকায় লেখা পাঠালেও সেসব লেখা প্রকাশ করা হয়নি। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ছাপাতে না পারা এমনই তিনটি কবিতা ১৯৭২ সালের ৪ জানুয়ারি দৈনিক বাংলার ‘মহিলা মহল’ পাতায় প্রকাশিত হয়। (সরকারি এ সংবাদপত্রের আগের নাম ছিল দৈনিক পাকিস্তান। মুক্তিযুদ্ধের পর নাম পরিবর্তন করে পত্রিকাটি দৈনিক বাংলা নামে প্রকাশিত হয়)। দুজন নারীর লেখা কবিতাগুলোর ওপর লেখা হয় ‘যে লেখা ছাপতে পারিনি’। সেখানে কবি মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা ও জরিনা আখতারের কবিতা ছিল। তবে এখানে এখন কেবল জরিনা আখতারের কবিতা ও সেই কবিতাসংক্রান্ত সাক্ষাৎকারই ছাপা হলো।

জরিনা আখতারের কবিতা লেখা শুরু ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে, স্কুলছাত্রী থাকাকালে। পেশাগত জীবনে ঢাকার লালমাটিয়া মহিলা মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে অবসর গ্রহণ করে এখনো লেখালেখিতে সক্রিয় তিনি।

তো ১৯৭১ সালে ‘সহমর্মিতা’ শিরোনামে জরিনা আখতার দৈনিক বাংলায় পাঠিয়েছিলেন দুটি কবিতা—‘বান্ধবীকে’ ও ‘দামাল কিশোর আজ’।

এই কবিতায় পাকিস্তানি সেনাদের গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের কথা উঠে এসেছে। এর ভাষা, শব্দপ্রয়োগ ও ভাবার্থের দিকে খেয়াল করলে পাঠকমাত্রই বুঝতে পারবেন, কবিতাগুলো যুদ্ধকালে কেন প্রকাশিত হয়নি।

কবিতা দুটিতে সমকালীন বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

জরিনা আখতার

১. বান্ধবীকে

শুনেছি তোমার ঘর নেই, এলোমেলো

হয়ে গেছে সব;

প্রিয় টেবিল, পুস্তক কোথায় বিলীন হলো।

তোমার ঠিকানা লুকানো ছিল

মাধবীর ঝাড়ে,

স্বাপদের নখের মতো কোনো নখ

তোমার ঠিকানা তুলে নিল;

বিস্কৃত মাধবীর ঝাড়ে পড়ে আছ,

তোমার ঠিকানা নেই।

শুনবে আমার কথা।

আমি ভালোই আছি, আমি যে সইতে জানি;

গোপন বেদিতে নিশিদিন বেদনার

নিধনযজ্ঞ ঘটাই।

যদি বেঁচে থাকো—

আমার নামের অস্ত্র ধারণ করো নিউজপেপারের পৃষ্ঠা হতে।

২. দামাল কিশোর আজ

অশান্ত চোখ তুলে কি দেখছ কিশোর।

লাটিম-ঘুড়ির সূঁচ জমে আছে

সবুজ ঘাসের বুকে;

কাদার ভেতর হতে চকচকে মাছেরা এসে লুটায় তোমার পায়ের কাছে।

কত দিন ডেকেছি তোমাকে,

হে দামাল কিশোর, পালিয়েছ হেসে।

আজ বড় কাছাকাছি এসে গেছ,

লাটিম-ঘুড়িবর্জিত হাতে কি তুলেছ আজ।

অশান্ত চোখ হাতে আমারই মতো

কি ছড়াতে চাও।

এসো হে কিশোর, আজ বধ্যভূমিতে

দাঁড়াতে হবে।

জরিণা আখতারের সাক্ষাৎকার

প্রশ্ন: ‘বান্ধবীকে’ ও ‘দামাল কিশোর আজ’ কবিতা দুটি মুক্তিযুদ্ধকালে ঠিক কোন সময় লিখেছিলেন?

উত্তর: কবিতা দুটো মুক্তিযুদ্ধকালে ঠিক কোন সময়ে লিখেছিলাম, তা মনে করতে পারছি না। তবে এইটুকু স্পষ্ট মনে আছে, স্বাধীনতার পরপরই আমার ওই কবিতা দৈনিক বাংলায় ‘যে কবিতা ছাপতে পারিনি’ শিরোনামে প্রকাশিত হয়। কিন্তু কবিতাগুলো তখন আমি সংরক্ষণ করতে পারিনি। ফলে হারিয়ে যায়।

প্রশ্ন: আপনি তখন ঢাকায় ছিলেন?

উত্তর: আমি ঢাকায়ই ছিলাম। থাকতাম আসাদ গেটসংলগ্ন একটি কলোনিতে, যেটিকে নিউ কলোনি বলা হতো। তখন এটি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ জায়গা। বিহারিদের আনাগোনা সব সময় লেগে থাকত। তারা নানা রকম ভয়ভীতি দেখাত।

প্রশ্ন: ১৯৭১ সালে অবরুদ্ধ বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে লেখালেখি করা বেশ কঠিন ছিল। আর কবিতা লিখে সেটি ‘দৈনিক পাকিস্তান’-এ পাঠানো তো খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ছিল।

উত্তর: মুক্তিযুদ্ধের সময় অবরুদ্ধ ঢাকায় বসে কবিতা দুটো লেখা এবং তা পত্রিকায় পাঠানোর ব্যাপারটি ছিল মূলত আবেগের তাড়না। মূলত মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন এবং নিজেদের স্বাধীন ভূখণ্ডের স্বপ্নের সপক্ষে কবিতা দুটো লিখেছিলাম। পরে ডাকমারফত সে কবিতা পত্রিকায়ও পাঠিয়েছিলাম। তখন আমি অনার্স তৃতীয় বর্ষে পড়ি। আজ বুঝতে পারি, সেদিনের বাস্তবতায় কতটা অপরিণামদর্শী ছিল আমার এই পত্রিকায় পাঠানোর ব্যাপারটি। কিন্তু আমি গর্বিত যে স্বাধীনতার পক্ষে আমার কলম কথা বলেছিল।

২০২২ সালের ২৯ নভেম্বর সাক্ষাৎকারটি নিয়েছিলেন বাশার খান

20.....

বুনো আঠালির গান

লেখা: রিমঝিম আহমেদ

আপাতত স্থির হয়ে আছি। মুক্ততার নাতিদীর্ঘ

হাওয়া পাতার মুঠোয় ভরে নিয়ে যাচ্ছে অন্য গ্রহে—

অন্য কোনো মৌবনে। সমুদ্র, পাহাড় ও অন্তহীন

পথ, **তোলপাড়** ঝড়ে মেলে রাখে পাগল আকাশ...

আপাতত এই পথ মিলনরহিত, এই পথে  
কাঁটার বিন্যাস—সরে যায় হাওয়া, পথের **ইঙ্গিত**  
গন্তব্য নিশানা পেতে এই পথে যেতে হবে তবু।  
জ্বর-জরা পায়ে ঠেলে যেতে হবে অবিমূশ্যতায়  
পাথর-বাগান ধরে যেতে হবে টলোমলো পায়ে  
যেতে হবে, যেতে হয় বুকে রেখে যত অনিশ্চয়  
অন্ধ হাতির যেমন ভয় থাকে—চোরা **গিরিখাতে**  
আগুনতৃষিত এই পথ টানে নিষ্পৃহ হাপর  
যে গান পতিত হলো এই পথে তারও কিছু সুর  
মেঘের পকেটে বাজে—মনে হয় বৃষ্টি হচ্ছে দূরে!

21.....

অবয়বে

লেখা: নাহিদ ধুব

কুঠার লুকাতে আমি জঙ্গলে ঢুকেছি কতবার  
আমাকে দেখিয়ে পথ, চলে গেছে কত জাগুয়ার  
**আশ্রমের** মতো ছিল, চেনা চেনা চারপাশ তবে—  
কোথাও নৈবেদ্য নেই, মানুষের চেনা অবয়বে  
ছিল না নীরব কোনো, ঘাতকের সমদর্শী মন—  
সিমারের ভালোবাসা পেয়েছিল মসীময় বন  
দেখেছি জলের মাঝে, মাছেরা করেছে ঢেউ চাষ  
বাতাসে বাতাসে হাসে, পাখিদের প্রাচীন আবাস  
আমাকে আপন ভেবে বুকে টেনে নিয়েছে পাহাড়  
কুঠার লুকাতে আমি জঙ্গলে ঢুকেছি যতবার।

22.....

নিরস্ত্র মানুষের গান

লেখা: শোয়াইব জিবরান

উন্মাদনা থেমে গেলে  
নিরস্ত্র লোকটি মন খারাপ করে বসে আছে  
চায়ের দোকানের সামনের বৈষ্ণিতে।  
তার প্রতি আর কারও কোনো ভ্রক্ষেপ নেই।  
অথচ একটু আগে যখন রাজার নামে দিচ্ছিল গালি  
লোকেরা কতই না তালি, আমোদে মেতেছিল।

চালা কাঠ হাতে তাড়া করলে পথিককে  
লোকেরা কতই না আদরে নিরস্ত্র করেছিল।  
ধুলো ছিটাতে চাইলে ফুটন্ত চায়ের পানিতে  
ভেঙে ফেলে চাইলে ক্যাশবাক্সের কাচ  
তবেই না দোকানি কলা-বনরুটি সেধেছিল।  
এখন সে নিরস্ত্র।  
পাগলামো থামিয়ে মন খারাপ করে বসে আছে  
খাবারের দোকানের সামনের বেঞ্চিতে।  
তার প্রতি আর কারও কোনো দ্রক্ষেপ নেই।

23.....

শান্তির গোলকধাঁধা  
লেখা: সাখাওয়াত টিপু

ইচ্ছে হয়, দিব্য আত্মার বাইরে  
মৃত আত্মার কাছে ফিরে যাই।  
এখানে যে জলপাইগাছের নিচে  
ফুরফুরে একটা জীবন কাটিয়ে  
দেওয়ার কথা, তার চেয়ে তার  
কম সময়েই চলে যেতে হয়!  
প্রত্যেক দুঃখের একেকটা ঘরে  
জেগে থাকে শুধু স্বপ্নটাই, আর  
পড়ে থাকে মায়ার ভেতর ছায়া!  
তা সত্ত্বেও **অস্ত্র** তো মানুষ নয়,  
তা সত্ত্বেও ভূখণ্ড নয় স্বাধীনতা!  
তারপরও স্মৃতি থেকে ভেসে ওঠে  
রক্তাভ মুখ, মানুষের এতিম কণ্ঠ!  
স্বপ্নে যে শিশুদের চিৎকার শুনে  
আমাদের ঘুম ভাঙে প্রতিদিন,  
সেখানেই লুকিয়ে থাকে এক  
পালানো শান্তির গোলকধাঁধা!

24.....

অনুচ্চারিত  
লেখা: রাজা হাসান



টিলার ঢাল বেয়ে ওঠানামা অতটা সহজ নয়।  
নির্জনতার সংকেতে কত কিছু ঘটে যেতে পারে,  
তুমি তার কিছুই জানো না।  
চাঁদের ভগ্নাংশ কোনো দিকনির্দেশনা দেবে না,  
পরিপার্শ্ব কেবল ঘোলাটে করে তোলে।  
যা ঘটে তা শুধু পিছুটান।  
পাখিদের অভিসন্ধি দূরের পথে পথে ছড়িয়ে পড়েছে,  
তুমি তার বিন্দুমাত্র বুঝবে না।  
পায়ের পাতার নিচ থেকে উঠে আসবে শিরশিরানি।  
বাকিটা অন্যমনস্কতা, পরিত্যক্ত সাপের খোলস, মনস্তাপ,  
কবেকার ভেঙে যাওয়া সম্পর্ক—  
সন্তপ্ত অসহায়তায় সবকিছু সয়ে যাওয়া—আর কিছু নয়।

25.....

সমীকরণ

লেখা: নর্মদা মিথুন

রাত্রি জেগে চিঠি লেখা  
হলুদ খামের ভাঁজ,  
সহজ কথায় বুঝিয়ে দিতে  
মনের কারুকাজ।  
বুঝিয়ে দিতে চন্দ্রমুখ  
বনজোনাকির গানে,  
জোছনাগলা হাতের লেখায়  
ভালোবাসার মানে।  
একজীবনের সমীকরণ  
যেমন তুমি চাও,  
মনের মতো লিখে দিয়ে  
সময় যখন পাও।  
বুঝিয়ে দিতে লিখে দিয়ে  
তোমার সকল বেলা,  
হোক না আমি অল্প বুঝি  
তোমার মনের খেলা।

26.....

বংশালে ভোর

লেখা: চপল বাশার

যদিও আলোকিত ভোরের আকাশ  
রাস্তার বাতি তখনো জ্বলছে  
একটি-দুটি রিকশা চলে টুংটাং  
ঘোড়ার গাড়ি ঢোকে বংশাল রোডে  
লোকালয়ে তখনো ভাঙেনি ঘুম  
বানর দুটি বসেছে দেয়ালে  
রাস্তার ধারে কুকুর ঘুমায়  
দরজা-জানালা খোলেনি কোনো ঘরে  
সংবাদ অফিস তখনো ফাঁকা  
মানসী সিনেমার গেটেও তালা  
সবাই আসবে কাজে, একটু পরে  
রাতজাগা ক্লান্তি দূর হয়ে গেলে  
চাঁদ মিয়া খোলে দোকনের ঝাঁপ  
আগুন জ্বালায়, চায়ের কেটলি উনুনে  
খদ্দের আসবে আর একটু পরে  
মতি সরদার হাঁটেন ধীরে ছড়ি হাতে  
আটটি দশক কেটে গেছে তার  
এই বংশালে পুরান ঢাকায়  
বন্ধুরা তার কেউ আছে কেউ নেই  
কেউ বা গেছে দূরে, বহুদূরে  
বংশাল রোড বড়ই নীরব ভোরে  
দোকানপাট খুলবে কিছু পরে  
চায়ের সঙ্গে চলবে বাকরখানি  
জমবে আড্ডা, দারুণ শীতসকাল  
মতি সরদার থাকেন দাঁড়িয়ে  
কোনো বন্ধুর দেখা যদি মেলে  
সরদারি নেই, নামেই সরদার  
বদলে গেছে এখন দিনকাল।

27.....

আবুল হাসানের অগ্রস্থিত কবিতা

Text not found

অকালপ্রয়াত কবি আবুল হাসানের এই কবিতা দুটির রচনাকাল ১৯৬৯ সাল। অগ্রস্থিত দুটি কবিতাই ছাপা হয়েছিল দৈনিক ইত্তেফাক-এ। প্রথম প্রকাশের ৫৪ বছর পর কবিতাগুলো পাওয়া

গেছে রাশেদুর রহমানের সৌজন্যে।

আমাদের সবার নিশ্বাসতরু আলো, অধিকার  
মুহূর্তে বিবর্ণ, কালো চিহ্নহীনতার দিকে টেনে নেয়, যার  
ক্ষুধার্ত প্রসার, তার সাথে এত ভোরে কী জরুরি কথা ছিল?  
কী এমন দরকারি, হিসাব-নিকাশ তার সাথে ছিল?  
গাড়ি পিছু ডেকেছিল, পুকুরের অনির্দিষ্ট খাড়ি পিছু ডেকেছিল  
যেয়ো না, যেয়ো না; শোনো, সুশ্যাম, সুউচ্চ সে গাছের নিখিলও  
ছিল করে মুখ ভার, মেঘের ভিতর রেললাইনের নীল অন্ধকার  
তবু কী প্রশান্তি দেবে বলে বলেছিল তোমাকে যাবার  
কথা, অত দূর, অত বহু দূর একা একা? আঁধারের আড়ালে **পরিখা**  
খুঁড়ে, তাতেই তোমার ভালোবাসা নির্মাণের নীল **মানচিত্র**  
এঁকে কোন শিল্পী অমন হো হো হেসে উঠে জীবনের সব সূত্র,  
পাতা ছিঁড়ে করে দিল একাকার? আমরা তোমার  
দিকে বেঁচে আছি, তুমি আমাদের দিকে হয়তো বা নও, একবার  
মানুষেরা বাঁচে, একবারই তার জীবনের অধিকার মঞ্চে জুরিত হয়  
গাড়িটি তাকিয়ে আছে আজও তবু; কালো এক প্রজাপতি হয়তো  
বা তোমার ছায়ায়।

সাহিত্য সাময়িকী, ২২ জুন ১৯৬৯

উজ্জ্বল **চাবির** মতো করতলে রেখে গেলে যে কালো বিদায়,  
তাকে নিয়ে গেছি আমি রণভূমি, শহরের ক্ষণস্থায়ী খোঁপে  
নিয়তির নল থেকে জীবনকাঁটার কষ্ট সারা গায়ে মেখে  
গিয়েছি মৃত্যুর কাছে, হে গোপন ছায়া এসে দিয়েছে ধিক্কার।  
অহরহ আজ শুধু ডেকে যায়, যাত্রী জানি,—পাপিয়ার গাড়ি,  
শোকের মতন খাদ্য অসম্ভব, **আলজিভে** দেখি প্রতিদিন  
বাসা বেঁধে খুঁটে খায় **হৃৎপিণ্ড** নীল স্বাস্থ্যতাবলি  
**ঝাঁঝিগুলি দাঁতে কাটে সযত্নে আমার নিদ্রা জ্যোৎস্নার ঝোঁপে!**

প্রতীক্ষার মতো তবু আজও কত ঘরবাড়ি আমার ভেতর  
প্রয়োজন-সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে তোমাকেই ডাকে;  
কয়েক মুহূর্ত শেষে ঘরবাড়ি ভেঙে যায়, স্বপ্নডায়েরিও।  
ছিঁড়ে যায়, ছিন্ন করে, তুমি সে মুহূর্তে জানি হাসছ, গোপন,  
প্রতীক্ষা তোমার—তবু বেঁচে থাকি, চোখে, কর্নিয়ার;  
প্রতীক্ষা তোমার—তবু দৃশ্য করি অস্তিমেরে, আত্মার অমল!

‘সাহিত্য সাময়িকী’, ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

আবুল হাসানের ইত্তেফাক-এ প্রকাশিত কবিতা অবলম্বনে অলংকরণ: আরাফাত করিম

লেখা: আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ

বারোটি মাস দিকদিগন্ত পরিভ্রমণ করে  
প্রথম সূর্য পূর্বাচলে উদ্ভাসিত।

পাহাড়-সমতট-জলধারা-বনরাজি

লতাগুন্ম জোনাকি

দোয়েল মুনিয়া পাখি

হরিণশাবক ছাগশিশু

একঝাঁক চাপিলার মতো বালক-বালিকা

হলুদের ছোপ-লাগা শালিক পাখির মতো

জননী

ন্যুজ্জদেহ মাতামহী

সকলেই উর্ধ্বমুখী—

পরম পিতা তুমি আমাদের প্রণতি গ্রহণ করো,

জাহ্নবীর পুণ্যস্রোতে অবগাহন করে

আমরা যেন শুচিশুভ্র হই

পর্বতশৃঙ্গ যেন কলুষমুক্ত হয়

অন্তরীক্ষ যেন অভিষিক্ত হয়

সমতটের মৃত্তিকা যেন ফলবতী হয়

অরণ্য এবং বনপাংশুল যেন

নিরাপদে থাকে।

তথাপি অমঙ্গলের ক্রন্দন কেন?

পরিব্রাজক সূর্য

তুমি কি দেখো নাই

লাঞ্ছিতা কিশোরীর মৃতদেহ?

তুমি কি দেখো নাই

অন্ধকারের অবগুণ্ঠনে আবৃত

যুবতীর অপরিসীম লজ্জা?

তুমি কি দেখো নাই

অসহিষ্ণু অধর্মের কশাঘাতে

ক্ষতবিক্ষত পল্লীবধূ

শ্রমজীবী নারীর দেহভস্ম?

তুমি কি দেখো নাই

বিচারালয়ের প্রাঙ্গণে

রক্তাপ্লুতা শিশুর গোলাপকুঁড়ি?

মঙ্গলময় প্রভু,

তুমি কি দেখো নাই

সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে নারকীয় কীটের দংশন?

আমার মায়ের মতো শিশিরের রোদ  
তোমার কাছে প্রার্থনা—  
ঘনসন্নিবিষ্ট অরণ্যের মতো  
আমাদের নীলিমায় সন্নিহিত করো  
দিকচক্রবালের মতো  
দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করো  
সেতার এবং সরোদের যুগলবন্দিতে  
নদী এবং সমুদ্রের মোহনার মতো  
উদ্বেলিত করো।  
নির্ঝরিনী জাহ্নবীর পুণ্যপ্রবাহে  
মুছিয়ে দাও বৈষম্যের পঙ্কিলতা  
ঘুচিয়ে দাও দ্বিধাদ্বন্দ্ব কলহ-কালিমা  
তরঙ্গিত আনন্দে  
কন্যাকুমারীকে উচ্চকিত করো  
রৌদ্রালোকে  
নবীন আশার খড়্গকে প্রজ্বলিত করো।  
জননী জন্মভূমি  
তোমার চরণে অঙ্গীকার  
তোমার শ্যামল অঞ্চলে  
রোদ-বাঁধা জীবনের অঙ্গীকার:  
যে হলাহল তোমার হৃদয়ের অমৃতকে  
নীলবর্ণ করেছে  
আমরা তা অঞ্জলি ভরে পান করব  
তোমার অশ্রুধারা অন্তরে ধারণ করে  
আমরা পরিমিত এবং পরিশুদ্ধ হব  
এবং প্রথম আলোর আনন্দলোকে  
ধ্বনিত হবে  
তোমার করুণার মূর্ছনা  
এবং আমাদের কণ্ঠে  
খজু ভালোবাসায় সুপ্রাচীন সংগীত  
১৯৯৮ সালের ৬ নভেম্বর প্রথম আলোর প্রথম সাহিত্যপাতা ‘শুক্রবারের সাময়িকী’তে কবিতাটি  
ছাপা হয়েছিল।

29.....

যে কারণে আবুল হাসনাতকে আমাদের মনে পড়ে  
লেখা: সাখাওয়াত টিপু

আজ ১ নভেম্বর কবি ও সম্পাদক আবুল হাসনাতের প্রয়াণবার্ষিকী। কেন সম্পাদক হিসেবে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিলেন তিনি?

কল্পনা ও রহস্য তোমার ধমনিতে লেগে আছে

আর আমি দেখি আমার করোটিতে খেলা করে

প্রতিরোধ ও প্রতিবাদের ভাষা।

একটি অক্ষর নামতে থাকে মায়ায়

দুটি অক্ষর নিয়ে রচিত হয় ভয়

তুমি এলে কল্পনায়

তুমি গেলে যন্ত্রণায়

ভয় নিয়ে কথা বলি প্রেয়সীর সঙ্গে

ভয় নিয়ে মধ্যরাতে মুখর থাকি

ভয় নিয়ে সন্ধেবেলা কানামাছি ভোঁ ভোঁ খেলি

(-‘অক্ষর’: মাহমুদ আল জামান, ২৪ জানুয়ারি ২০১৯)

এমন একসময়, ভয় আমাদের করোটিতে খেলা করে। আমাদের কল্পনা আর রহস্যের ভেতর ভয় মুখর থাকে। এমনকি অক্ষরও ভয়ে কঁকড়ে আছে। এমন সংবেদনশীল কবিতাটি মাহমুদ আল জামানের। মানে আবুল হাসনাতের! নানা ভয় আর মৃত্যু এখন আমাদের সঙ্গী। তবে কিছু মৃত্যু আছে খুব হালকা। হালকা এ কারণে, পূর্ণ বয়স যাপন করে ইহজগত গত হওয়া। আবার কোনো শোক, কোনো সভা, কোনো সমবেদনার অক্ষরে পূর্ণ করা সত্যি কঠিন! কবি, লেখক ও সম্পাদক আবুল হাসনাতের অকালে চলে যাওয়া ছিল ঠিক একই রকমের ভারী ব্যাপার। ৭৫ বছরে তিনি গত হন। কর্মক্ষম অবস্থায় তাঁকে অকালে বিদায় জানাতে হয়েছিল আমাদের। তাঁর মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্য একজন সংবেদনশীল, নির্বিবাদী, নিরহংকারী, নিভৃতচারী ও অজাতশত্রু লেখক ব্যক্তিত্বকে হারাতে হয়েছিল।

ষাটের দশকের ছাত্র আন্দোলন, বামপন্থী রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন আর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আবুল হাসনাতের অবদান অতুলনীয়। কারণ, ষাটের দশকে বেড়ে ওঠা সচেতন তরুণেরা টের পাচ্ছিলেন, অনির্বচনীয় পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভেতর জন্ম নিচ্ছিল একটি নতুন রাষ্ট্রের রাজধানী। সেই নতুন স্বাধীন দেশের স্বপ্ন তাদের রাজপথের লড়াই আর বুদ্ধিবৃত্তিক-সাংস্কৃতিক লড়াই একই সুতায় গেঁথে দিয়েছিল। তিনি ছিলেন সেই স্বপ্নের একজন সার্থক সতীর্থ। তাঁর স্বপ্নের পাঠাতন ছিল দেশ-মাটি-মাতৃকা আর গণমানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেটা সফল হয়েছে, আবার কোনো ক্ষেত্রে সেটা সফল হয়নি। তবে আবুল হাসনাতদের সবচেয়ে বড় সাফল্য হলো ষাটের দশকের উত্তাল ছাত্র আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন, যা উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নিয়েছিল। এর শেষ ফলাফল একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এবং আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ। সে প্রসঙ্গ ভিন্ন! আমাদের প্রসঙ্গ আবুল হাসনাতের সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব।

আবুল হাসনাত দুইভাবে আমাদের সামনে হাজির আছেন। প্রথমত সাহিত্যিক হিসেবে, দ্বিতীয়ত সম্পাদক হিসেবে। দুটো নামে তিনি লিখেছেন—আবুল হাসনাত স্বনামে, আবার মাহমুদ আল জামান নামে। পারিবারিক রাজনৈতিক পরিসরের জন্য আমাদের পরিচিত ছিলেন দুজন ব্যক্তিত্ব। তাদের একজন সাপ্তাহিক ‘একতা’ ও ‘মুক্তির দিগন্ত’ পত্রিকার সম্পাদক মতিউর রহমান, অন্যজন ‘গণসাহিত্য’ ও ‘সংবাদ’-এর সাহিত্য সম্পাদক আবুল হাসনাত। খুব ছোটবেলায়, বেড়ে ওঠার বয়সে সম্পাদিত ‘গণসাহিত্য’ পত্রিকার দু-এক কপি বাসায় থাকার সুবাদে নাড়াচাড়া করার সুযোগ

হয়েছিল। আর 'সংবাদ', 'একতা' ও 'মুক্তির দিগন্ত' নিয়মিত রাখা হতো আমাদের বাসায়। এসব পত্রিকার পাশাপাশি রুশ-চীনা সাহিত্যের বড় সংগ্রাহক ছিলেন আমার বড় চাচা, সন্দ্বীপের নামজাদা মুক্তিযোদ্ধা সফি উল্লাহ। ফলে পত্রিকাগুলো আমাদের সাহিত্যরুচি, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চিন্তায় প্রভাব ফেলেছে বিস্তর।

আজকের একবিংশ শতাব্দীতে আমরা সম্পাদনার ভালো-মন্দ নিয়ে নানা কিছুর সমালোচনা করতে পারি। কিন্তু বাংলাদেশে শিল্প-সাহিত্যের সমালোচনা চিন্তার পরিসর যাঁরা সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁদের অন্যতম আবুল হাসনাত। মানে আমাদের হাসনাত ভাই। দুজন কিংবদন্তি সাহিত্যিক রণেশ দাশগুপ্ত ও সন্তোষ গুপ্তের পরে আবুল হাসনাতের যুগ শুরু। আড়াই দশকের বেশি সময় তিনি 'সংবাদ সাময়িকী' সম্পাদনা করেন।

তৎকালীন সরকারশাসিত দৈনিক 'বাংলা' পত্রিকার বাইরে 'সংবাদ'ই ছিল আপামর পাঠকশ্রেণির কাছে বিকল্প সাহিত্য-সংস্কৃতির বৃহত্তর পরিসর। বেশ আগে ঘরোয়া আড্ডায় হাসনাত ভাইয়ের একুশ বছরের সহকর্মী চিত্রশিল্পী বীরেন সোমের কাছে শুনেছিলাম, 'তিনি [হাসনাত ভাই] ছিলেন এতই তীক্ষ্ণ, আদর্শিক দৃঢ়চেতা মানুষ, শিল্পের জন্য কোনো কিছু সঙ্গে আপস করেননি।'

হাসনাত ভাইয়ের সঙ্গে আমার যোগাযোগ অনেক পরে। সাক্ষাৎ-পরিচয় হয় নব্বই দশকের শেষ মাথায়। সাপ্তাহিক 'একতা'য় কাজ করার সুবাদে। কারণ 'একতা'র পেস্টিং ও ছাপা হতো 'সংবাদ' প্রেসেই। এই সময় দু-চার বাক্য কুশল বিনিময় ছাড়া বিশেষ আলাপ হয়নি। আমি কখনো লেখা নিয়ে সরাসরি তাঁর কাছে যাইনি। একটা মজার ঘটনা বলি, নব্বই দশকের শুরুতে ছাত্রাবস্থায় আমি রূপকথার রাজা হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান এন্ডারসনের লেখা মনোযোগ দিয়ে পড়ি। সে সময় এন্ডারসনকে নিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখি। প্রবন্ধটি চট্টগ্রামের পরিচিত এক পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদককে দিই।

তিনি আমার প্রবন্ধ রেখে অন্য আরেকজনের এন্ডারসনকে নিয়ে লেখা প্রবন্ধ ছাপেন। তবে এন্ডারসনকে নিয়ে আমার লেখা ছাপা হওয়া প্রবন্ধের চেয়ে মন্দ ছিল না! খুব মন খারাপ হয়েছিল সে ঘটনায়। তার এক মাস পর ব্যক্তিগত পরিচয় ছাড়া ডাকযোগে হাসনাত ভাইকে সে প্রবন্ধটি পাঠাই। আনন্দের ব্যাপার, পরের সপ্তাহে 'খেলাঘর' পাতায় প্রবন্ধটি প্রধান রচনা আকারে ছাপা হয়। সেই ঘটনার পর চট্টগ্রামের ওই সম্পাদক আমাকে বিশেষ সমীহের চোখে দেখতেন!

'কালি ও কলম' পত্রিকায় যোগ দেওয়ার পর তিনি প্রায় ফোন করতেন। প্রায়ই লেখা চাইতেন।

দুয়েকবার বলেও ছিলেন, আমি যাতে আমার বন্ধুদের বলি 'কালি ও কলম'-এ লেখা পাঠাতে।

একবার একটা দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। হাসনাত ভাই 'কালি ও কলম'-এর বিশেষ সংখ্যার জন্য কবিতা নিয়েছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক প্রসঙ্গ থাকায় তিনি কবিতাটি ছাপাতে অনাগ্রহ প্রকাশ করেন এবং নতুন অন্য কবিতা দিতে বলেছিলেন।

যেদিন সর্বশেষ পেস্টিং, সেদিন তিনি আমাকে তিনবার ফোন করেছিলেন। বলেছিলেন, 'আপনি একগুচ্ছ লেখা দিন, পৃষ্ঠা খালি রেখেছি!' সেদিন তাঁকে বোঝাতে সক্ষম হইনি, আমি জ্বরে কাবু ছিলাম একলা ঘরে। আর বাসা থেকে পাঠানোর মতো ব্যবস্থা ছিল না আমার। সেদিন আমি 'সরি' বলেছিলাম। কিন্তু কখনো বুঝতে পারিনি, তিনি আমার ওপর খানিক উষ্ণ ছিলেন কিছুদিন। হয়তো হাসনাত ভাই ক্ষমা করে দিয়েছিলেন আমার অপারগতার জন্য। কারণ, আমার অগ্রজ প্রজন্মের একজন সৎ, সংবেদনশীল ও দায়িত্বশীল সম্পাদক হাসনাত ভাই।

হাসনাত ভাই মৃদুভাষী ছিলেন ঠিক, প্রয়োজন হলে তিনি যথাযথই কথা বলতেন। আরেকটি ঘটনার কথা না বললেই নয়! এক-এগারোর পর আমরা শহীদ নূর হোসেন নিয়ে প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ ও গবেষণা করতে গিয়ে হাসনাত ভাইয়ের শরণাপন্ন হয়েছিলাম একবার। বন্ধু চলচ্চিত্র পরিচালক,

নাট্যকার মঈনুল শাওন আর আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করি ‘কালি ও কলম’ অফিসে। আমরা জানতে গিয়েছিলাম বাংলাদেশে আশির দশকের সংবাদপত্রের হালহকিকত। আমার ধারণা ছিল, হাসনাত ভাই কথা বলেন খুবই কম! কিন্তু তাঁর সম্পর্কে আমাদের মনে যে মৃদুভাষীর ভাবমূর্তি ছিল, সেটা মিইয়ে যায় প্রায় তিন ঘণ্টার আলাপে। সেদিন হাসনাত ভাই আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও এরশাদবিরোধী আন্দোলনের অনেক তথ্য-উপাত্তের সন্ধান দিয়েছিলেন। আর আমরা নোট করছিলাম। তিনি বলেছিলেন, শহীদ নূর হোসেনের পরিবারের সঙ্গে সখ্যভাব বেশি সাংবাদিক ও লেখক মতিউর রহমানের, আমরা যেন মতি ভাইয়ের কাছে যাই। কবি শামসুর রাহমান ও মতিউর রহমানের যৌথগ্রন্থ ‘শহীদ নূর হোসেন’ যাতে জোগাড় করি। কবি শামসুর রাহমানের একটি বিখ্যাত কবিতা ওই যৌথগ্রন্থে সংকলিত হয়। সেই কবিতার শিরোনামে আমরা শহীদ নূর হোসেনকে নিয়ে নির্মীয়মাণ প্রামাণ্যচিত্রটির নাম রেখেছিলাম—‘বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়’। খেয়াল করলাম, কথা বলার সময় হাসনাত ভাইয়ের চোখ থেকে উজ্জ্বল ভাব ঠিকরে বেরোচ্ছে। স্বর স্মিত, কিন্তু দৃঢ়। আমাদের হাসনাত ভাই মানে মাহমুদ আল জামান ছিলেন একাধারে কবি, শিশু সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক ও শিল্প সমালোচক। কবিতা তিনি বেশি লেখেননি, কিন্তু লিখেছেন আধুনিক কবিতা। প্রচ্ছন্নভাবে দেশ, মানুষের স্বাধীনতা, স্মৃতিময় মায়া আর মানুষের মুক্তির কথা বলেছেন। তাঁর শিল্প সমালোচনা ও শিল্পবিষয়ক বইয়ের সম্পাদনা আমাদের শিল্পকলার জগৎকে চেনার পথ বাতলে দিয়েছে। প্রকৃত অর্থে, তিনি শুধু সম্পাদক ছিলেন না, ছিলেন একজন সাহিত্য আর শিল্প-অন্তপ্রাণ। চিত্রকলা নিয়ে হাসনাত ভাইয়ের জানাশোনা ছিল অগাধ। শিল্প সংগ্রহও ঈর্শনীয়। তাঁর সবচেয়ে বড় গুণ—শিল্প কিংবা সাহিত্যের ক্ষেত্রে নির্লিপ্ত বাছাই গুণ। নিজের লেখার চেয়ে তিনি যে দেশের শিল্প-সাহিত্যের পাটাতন ও প্রজন্মের লেখকদের ভিত সৃষ্টি করেছিলেন, তা উজ্জ্বল হয়ে থাকবে অনেক দিন। বস্তুত তিনি সাহিত্যের বাহ্যিক নায়ক ছিলেন না, ছিলেন অন্তঃপুরের অনন্য কারিগর। মনে পড়ছে, করোনা মহামারির অগণন মানুষের মৃত্যুর কথা। মহামারির শুরুর দিকে মারা যান চিলির কিংবদন্তি বিপ্লবী লেখক, কবি ও সাংবাদিক লুইস সেপুলভেদা। তাঁর মৃত্যু সে সময় বিশ্ব সাহিত্যকে স্তম্ভিত করেছিল। তেমনি আবুল হাসনাতের অকালপ্রয়াণ বাংলাদেশে শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতে অপার শূন্যতা তৈরি করেছিল। তবু বলব, মৃত্যু হচ্ছে মানুষের ইহজাগতিক স্থিতি থেকে নৈঃশব্দ্যে চলে যাওয়া। মানে ব্যক্তির দৃশ্যমান জগৎ ছেড়ে মানুষের আড়ালতম স্মৃতিতে পৌঁছে যাওয়া।

তবে যে দৃশ্য বা কথা একবার স্মৃতির কুঠুরিতে ডুব দেয়, তাকে ভোলা সবচে কঠিনতম কাজ। ভোলা অসম্ভবও বটে। আবুল হাসনাত নানাভাবে আমাদের বেড়ে ওঠার সময়ে চিন্তায় আর লড়াইয়ে ছায়াপাত করেছিলেন নির্মোহভাবে। কি রাজনৈতিক কর্মে, কি শিল্প-সাহিত্যে, কি সাংস্কৃতিক অচলায়তনে—তিনি ছিলেন সমাজের অগ্রগণ্য একজন পথিক। তাই তিনি আমাদের কাছে চির অম্লান। আমরা চিরঋণী কিংবদন্তি আবুল হাসনাতের কাছে।

30.....

মৃত্যুর আগে কি কোনোই জীবন নেই

লেখা: হিজল জোবায়ের

৭ অক্টোবর সকালে ইসরায়েল ভূখণ্ডে হামাসের অতর্কিত আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে আবার শুরু



হয়েছে ইসরায়েল-ফিলিস্তিন যুদ্ধ। দশকের পর দশক ধরে মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে  
চলেছেন ফিলিস্তিনিরা। ফিলিস্তিনি কবি মুরিদ বারগুতির এই কবিতায় ধরা পড়েছে সেই সুর—  
নিপীড়িত ফিলিস্তিনবাসীর বেদনা আর বর্তমান পরিস্থিতি। অনুবাদ করেছেন হিজল জোবায়ের  
তাকালাম নিজের দিকে:

কোনোই সমস্যা নেই আমার।

একদম ঠিকঠাক আছি,

আমার ধূসর চুল আকর্ষণীয়ই মনে হবে

কিছু কিছু মেয়ের কাছে;

সুন্দর করে বানানো আমার চশমা,

শরীরের তাপমাত্রা একদম ৩৭,

ইন্ড্রি করা শার্ট

আর জুতা জোড়াও আরামদায়ক।

কোনোই সমস্যা নেই আমার।

হাতে নেই হাতকড়া

এখনো জবান বন্ধ করে দেওয়া হয়নি,

এমনকি কারাগারেও যেতে হয়নি আমাকে

ছাঁটাই করা হয়নি কাজ থেকে,

কয়েদখানায় আত্মীয়স্বজনদেরও দেখতে যেতে পারি,

নানান দেশে তাঁদের কবর জিয়ারতেও

যেতে দেওয়া হয় আমাকে।

কোনোই সমস্যা নেই আমার।

বন্ধুর মাথায় শিং গজিয়েছে

তা নিয়ে মোটেও বিচলিত নই আমি,

পোশাকের তলায়

লেজ লুকিয়ে রাখায় তার চাতুরি আমার পছন্দ,

পছন্দ ওর শান্ত থাবাও;

আমাকে সে খুনও করতে পারে

কিন্তু বন্ধুত্বের খাতিরে

তাকে আমি ক্ষমা করে দেব;

যেকোনো সময়

আমাকে আঘাত করতে পারে সে।

কোনোই সমস্যা নেই আমার।

টিভিতে উপস্থাপকের হাসিতে

মোটেও আর অসুস্থ বোধ করি না,

খাকিরা আমার স্বপ্ন, রাত আর দিন রুদ্ধ করে দেয়

তা-ও সয়ে গেছে;

সে কারণেই সব সময় পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখি,

এমনকি সুইমিংপুলেও।

কোনোই সমস্যা নেই আমার।  
গতকাল রাতের ট্রেনে চড়ে বসে আমার স্বপ্নেরা  
আর আমি বুঝেই উঠিনি  
কী করে তাদের বিদায় জানাতে হয়।  
শুনলাম, এক **উষর উপত্যকায়**  
বিধ্বস্ত হয়েছে সে ট্রেন  
(কেবল ট্রেনের চালক বেঁচে গেছে)।  
খোদাকে শুরুরিয়া জানালাম  
আর ব্যাপারটাকে সহজ করে নিলাম,  
যেহেতু ছোটখাটো দুঃস্বপ্ন হয় আমার,  
আশা করি এগুলোই একদিন  
দূর্দান্ত এক স্বপ্নের জন্ম দেবে।  
কোনোই সমস্যা নেই আমার।  
জন্মের প্রথম দিন থেকে আজ অবধি  
নিজের দিকে তাকিয়ে আছি আমি,  
নিরাশার কালে শুধু মনে রাখি—  
মৃত্যুর পরও এক জীবন আছে;  
ফলে কোনোই সমস্যা নেই আমার।  
কিন্তু প্রশ্ন রাখি:

হে খোদা,

মৃত্যুর আগে কি কোনোই জীবন নেই?

ফিলিস্তিনি কবি মুরিদ বারগুতিকে বর্তমান ফিলিস্তিনের শীর্ষ কবিদের একজন বলে মনে করা হয়।  
ইসরায়েল রাষ্ট্রের জন্মের ৪ বছর আগে ১৯৪৪ সালের ৮ জুলাই পশ্চিম তীরের রামাল্লায় তাঁর জন্ম।  
মারা গেছেন ২০২১ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি ৭৬ বছর বয়সে, জর্ডানের রাজধানী আম্মানে।  
১৯৬৭ সালে আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের সময় উচ্চশিক্ষার্থে মিসরে ছিলেন মুরিদ বারগুতি, কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যে পড়তেন। যুদ্ধে আরবদের পরাজয় হলে ইসরায়েল যখন গাজা ও পশ্চিম তীর দখল করে নিল, তখন বিদেশে থাকা অন্যান্য ফিলিস্তিনির মতো মুরিদ বারগুতিকেও মাতৃভূমিতে ফেরার অনুমতি দেওয়া হয়নি। ৩০ বছর পর রামাল্লাহে যাওয়ার অনুমতি পান তিনি। ইসরায়েলি আগ্রাসন ও দখলদারির মুখে জীবনের বেশির ভাগ সময় এই কবি কাটিয়েছেন লেবানন, জর্ডান, ইরাক, কুয়েত, হাঙ্গেরি ও মিসরে।

মুরিদ বারগুতি ছিলেন কিংবদন্তিতুল্য ফিলিস্তিনি কবি মাহমুদ দারবিশের বন্ধু। আরবি ভাষায় তাঁর ১২টি কবিতার বই প্রকাশ পেয়েছে। কবিতা অনূদিত হয়েছে ইংরেজিসহ বিভিন্ন ভাষায়।

প্যালেস্টাইন অ্যাওয়ার্ড, নাগিব মাহফুজ মেডেলসহ নানান পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

বারগুতির স্ত্রী মিসরের প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক রাদওয়া আশোরের অনুবাদে মিডনাইট অ্যান্ড আদার পোয়েমস নামে প্রকাশিত হয় কবির কবিতার একটি ইংরেজি সংকলন। এখানে পত্রস্থ বাংলায় অনূদিত কবিতাটি সেই বই থেকে নেওয়া।

কী আলো শূন্যের মাঝে ছড়িয়ে  
 নীড়ের পাখিরা উড়ে চলে নদীর কিনারায়,  
 মেঘের পাথরে আঁকা শুভ্রতা ছুঁয়ে  
 স্বপ্নপথে সব ভুলে হাজারো স্মৃতি রেখে যায়।  
 কী ঠুনকো মায়ার বাঁধন টুটে  
 চিরন্তন আঁখি মেলে হেঁটে চলে কোন দূর টানে,  
 বহু সাধনার রং মেখে সে তাকায়  
 ভাসমান মেঘের মতো অবাধ্য বিজলির পানে।  
 কী প্রোজ্জ্বল তাপন গায়ে তেড়ে এসে  
 ফুঁ দেয় ছাই হওয়া উচ্ছিষ্ট পতিত কঙ্কালে,  
 অনিশ্চয়তার আঁচিলে মোড়ানো ভাগ্য  
 হামিংয়ের অশান্ত ডানায় খুঁজে ফেরে রঙিন সকালে!  
 কী শঙ্কিত অজানা নিয়তির প্রয়াণে  
 সুখেরা পাড়ি জমায় বৃহৎ দক্ষিণ-চীন সাগরে,  
 চিন্তে লুকানো আশার বাতাস ছুঁয়ে  
 অপরিণয়ের লালসা বুকে ছিটকে যায় নিষ্ঠুর নাগরে!  
 অজানা পথে একা হেরিটেজ রেলওয়ে স্টেশনে,  
 আলোর আসার অপেক্ষায় সন্ধ্যাবেলা শুরু হলো;  
 কোনো সংশয় ছিল না মনে!  
 প্রেমহীন একলা চলার পথ সমুদ্রের মতো সমতল,  
 এখনো সে প্রশ্ন করে যে মনে সে কোথায় থাকে;  
 এত দিন পর সে কার পাশে, কে তার পাশে অচল!  
 শুধু শুধু আঁধারে একা একা রাস্তা হারিয়ে ফেলে,  
 অচেনা পাহাড়ের সামনে আজ একাই কেবল প্রতিফলিত;  
 শরতের শুভ্র স্নিগ্ধতায় লেপটে রয়েছে, যা হারিয়েছে হেসেখেলে!  
 আজও তার স্মৃতিমাথা সুপ্ত মায়াজুলো নিরালায় খুঁজে ফেরে,  
 বৈশাখী মেঘের তলে একটি মুখ ছিল শুধু তার একান্ত দৃষ্টি;  
 প্রকৃতির নীরবতায় রংধনুর মিতালিতে মায়াবী কানন ছেড়ে!  
 তার প্রেম ছিল সূর্য, যা মনে জেগেছিল রাতের চাঁদ হয়ে,  
 সেই হেরিটেজ স্টেশনে আজও ফিরে আসে নির্বিঘ্নে;  
 দিন এসে গেছে জীবন পাল্টে গেছে একক্ষণে সময়ও যায় বয়ে!  
 গ্রীষ্মের বলে  
 সূর্য আরও উগ্র হয়ে উঠেছে আকাশে,  
 সুখের আলোর সাথে জ্বলে আর আগুনের প্রাকாশে।

প্রবল খরায়

পৃথিবী জ্বলছে জ্বলন্ত রঙে,

জলতাত্ত্বিক বাতাস বাঁশি বাজায় অজানা হাসির সঙ্গে।

কুয়াশাচ্ছন্ন আঁধারে

শীতের রাত্রি যখন দূর থেকে দূরে চলে যায়,

বর্ষার মাঝে এসে মেঘ হানে নেশার জলধারায়।

জ্যেষ্ঠের দাবদাহে

দারুণ গরমে জলের জ্বালার প্রতি স্পর্শে,

মন ভাবিয়ে আনছে আকস্মিক উল্কা-স্পন্দনে।

কালবোশেখীর

বজ্র হাওয়া বাজায় ঝড়ে রঙিন লীলা বীণাতারে,

পৃথিবী মেলে গভীর অমাবস্যার বিধুর আঁধারে।

ধানসিঁড়ি নদী

স্পন্দন করে সদা ভরা সুখের ভাবুক জীবনানন্দে,

প্রকৃতির চেতনা জাগিয়ে দিলে অতীব তীব্র সানন্দে।

ব্যাকুল ধরণীতে

আদিত্য উত্তাপে পিপাসায় মরে সিতাংশু জল চায়,

বিদঘুটে ব্রহ্মাণ্ডে তারা তবু বসে থাকে প্রকৃতির আশ্রয়।

ক্ষণিক নাগলোকে

স্বীয় মমতায় আবরণ করে কোমল প্রসূন পুঁতে,

কবিতায় নিবেদিত হয় শরতের নগরী অনন্তে।

পাহাড় গিরি শোভিত এক দানব আকৃতি,

শ্বেত মেঘের ঝলমলে মায়াবী নীরব প্রকৃতি।

হিমশীতল পরশে বুভুক্ষু চিণ্ডে সমৃদ্ধির মিশ্রণে,

নির্মলতায় সব হারিয়ে যায় কোন সুদূর বন্ধনে!

উদিত আলোর প্রতিচ্ছবি বিচিত্র পাথরের জল,

সৃষ্টিরহস্যে উদ্ভাসিত অজানা সে অদৃশ্য অতল!

পাহাড়ের অপলক চোখধাঁধানো বাতাস ঝাপটিয়ে,

চিত্রকবিতার হাওয়া ফুলগুলো মিলে যায় রং ছিটিয়ে।

স্পর্শে তার ঠান্ডা কখনোবা পবকের নেয় কঠোর,

জ্বলে ওঠে সুখের দানী আত্মশক্তিহীন এক বিষ্টর।

শূন্য মনে হানা দেয় পাহাড়ের বিচ্ছিন্নতার সুর,

হঠাৎ বৃষ্টিতে বেজে ওঠে গানের প্রতিচ্ছবি কত দূর!

পাহাড়ের পিঠ বেয়ে সৃষ্টিত মেঘের অসীম জলধরা,

চাঁদের পর্বত হয়ে মন ওড়ে তবু নিয়তির ঘন খরা!

শিখর ছাপিয়ে মনের অসীম উদ্দীপনা দোলা দেয়,

সকলের চেয়ে শান্তি সেই পাহাড়ি প্রশান্তির ছায়ায়!

রাজীব আশরাফের অপ্রকাশিত কবিতা

লেখা: রাজীব আশরাফ

১ সেপ্টেম্বর চলে গেলেন 'হোক কলরব' গানের গীতিকবি রাজীব আশরাফ। এই তরুণ কবির মৃত্যুর পর কয়েক দিন ধরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বারবার উচ্চারিত হয়েছে তাঁর কবিতা ও গান।

এভাবেই দেখেছিলাম উষ্ণতম দিনে সমুদ্রতটে

বিশৃঙ্খল বাতাসের দেহে

ফসিল পাতরা ভাসে,

ম্রিয়মাণ হয়ে নয়, প্রসূতির জরায়ুতে

তীব্র আর্তনাদের মতো;

কিংবা ক্ষয়িষ্ণু জন্মের কথা কি আর শুনতে চাও আমার কাছে?

আমি গল্প বলিয়েদের দলপতি নই!

চেতনাবিরোধী মেঘের সঞ্চালকও নই,

তবু মাথার ভেতরে শুষ্ক জীবের মতো

উষরতা পরিত্যাগী স্বাদ বসে থাকে;

বীজহীন আবাদি জমির পরিভ্রমণে

নিঃসঙ্গ, একাকী ক্ষুধার্ত শাবক।

হে শুষ্ক পাতা,

তোমাকেই কি সে খুঁজে নেবে অথবা

মৃত্যুহীনতার উর্বরতা,

সুদীর্ঘ দিবসের সন্ধান করে কীভাবে?

ফেরারি চাঁদের মতো পৃথিবীতে এসে

স্মৃতিহীন পথিকের প্রতিটা পথই নতুন;

নতুবা এ সমগ্র জীবনযাপনে

তোমাকে অভিভূত করে সন্ধ্যা কিংবা

সকাতর সকালের আলো-সকল;

তবে পুনর্জন্মতাই ভাসমান ভাস্কর্য,

সহজাত বেদনার দলবদ্ধতাই

প্রজাপতি হয়ে ভাসে,

বিষণ্ন চোখের আরাম হতে চেয়ে।

মরে গিয়ে বেঁচেছে অনেক—ইতিহাসে

লেখা আছে তাদের গল্প শত শত,

তবু আমরা কেন একে অপরের প্রেমে

রক্তমাত আর আহত!

বিষাদের হাতে ধরে হতাশার পথে

বিষণ্ততার দেশ খুঁজে পেলে কোনোমতে  
প্রিয় মৌনতাকে শোনাই খোলা চিঠিতে  
এক দুঃখ বিরহী গান বসে রুক্ষ মাটিতে  
অযথাই অজস্র কিছু ভাবি, অহেতুক!  
মেনে তো নিতেই হবে একদিন চিরনিদ্রা  
বেঁচে থাকা প্রতিটি মানুষ কালো কৌতুক  
অথচ ভিন্ন জীবন খোঁজে ইতিহাসবিদেরা!  
কীই-বা বলার আছে  
কতটুকু হয় বলা,  
অল্প আগুন-আঁচে  
দীর্ঘ সময় গলা;  
গলতে গলতে ধীরে  
তলিয়ে যাচ্ছে কেউ,  
মায়ার্দ্র জাল ছিঁড়ে  
থামিয়ে নদীর ঢেউ—  
কেনই-বা সে থামায়  
কেনই-বা কেউ থামে,  
কেউ ডাকে না আমায়  
কোনো নামে বা বেনামে;  
নাম খুঁজতে গিয়েও  
হারিয়ে ফেলার পথে,  
এ জীবন অনুমেয়  
যা বাঁচাই কোনোমতে!

‘হোক কলরব’, ‘প্রকৃত জল’, ‘নাম ছিল না’, ‘রোদ বলেছে হবে’, ‘লাস্টবেঞ্চ’, ‘যাযাবর পাখনা’সহ অনেক জনপ্রিয় গানের গীতিকবি রাজীব আশরাফ। বোহেমিয়ান শিল্পী রাজীব আশরাফ। একজন মানবিক মানুষ রাজীব আশরাফ। তাঁর মৃত্যুর পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁকে নিয়ে সরব হয়েছেন অনেকেই। সবার মুখে ফিরে ফিরে এসেছে রাজীবের গান, কবিতা আর স্মৃতিকথা। কবিতা ও গান লেখার পাশাপাশি চলচ্চিত্রও নির্মাণ করেছেন ক্ষণজন্মা এই কবি। জীবনকে তিনি যাপন করতে চেয়েছিলেন কবিতার মতোই—পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে করতে। লিখেছেন মূলত ছোট কাগজে। তিনি যে কবিতা আর গানের মধ্যে কখনো ভেদরেখা টানেননি, তা তাঁর অপ্রকাশিত কবিতাগুলো পড়লেই বোঝা যাবে। জীবদশায় ধরেছি রহস্যাবৃত মহাকাল নামে রাজীব আশরাফের একটি মাত্র কাব্যগ্রন্থই প্রকাশিত হয়েছিল।

এর বাইরেও রাজীব লিখেছেন অজস্র কবিতা। যেমন ‘পুনর্জন্ম’ কবিতাটি লিখেছিলেন ২০০৭ সালে আমার দিনপঞ্জিতে। আর অন্য কবিতাগুলো ২০২১ সালের দিকে আমাকে তিনি পাঠিয়েছিলেন ফেসবুক ইনবক্সে। তবে কবিতা লেখার প্রতি তাঁর যত আগ্রহ ছিল, তা সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যাপারে তিনি ততটাই ছিলেন উদাসীন। অনেক কবিতারই কোনো শিরোনাম দেননি তিনি। এখানে পত্রস্থ কবিতাগুলোর মধ্যে কেবল ‘পুনর্জন্ম’-এর শিরোনাম তাঁর দেওয়া। বাকিগুলোর নাম তাঁর মৃত্যুর পর দেওয়া হয়েছে। জানা মতে, এসব কবিতা এখন অবধি কোথাও প্রকাশিত হয়নি। কবিতাগুলোর মধ্য

দিয়ে অসময়ে চলে যাওয়া এক দ্রোহী ও প্রেমিক কবিকে খুঁজে পাওয়া যাবে।

33.....

একজনই রাজীব আশরাফ

লেখা: উম্মে রায়হানা

অকালপ্রয়াত গীতিকবি রাজীব আশরাফ স্মরণে চারুকলার বকুলতলায় আজ ‘হোক কলরব’ নামে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন তাঁর বন্ধুরা। বিকেল পাঁচটা থেকে শুরু হয়ে অনুষ্ঠানটি চলবে রাত অবধি। অনেক জনপ্রিয় গানের গীতিকার, তরুণ কবি রাজীব আশরাফ মানুষ হিসেবে, বন্ধু হিসেবে কেমন ছিলেন—এ লেখায় সে কথাই লিখেছেন তাঁর এক বন্ধু।

আমি আর আমাদের বন্ধু পল জেমস গোমেজ বসে ছিলাম আজিজ মার্কেটের দোতলার বারান্দায়। পাঠক সমাবেশের ওপরে যেখান থেকে রাস্তা দেখা যায়, হঠাৎ সেখান থেকে রাস্তার ওইপারের ফুটপাথ ধরে হাঁটতে থাকা একটা ছেলেকে দেখে চিৎকার করে ডাকল পল, ‘এই রাজীব, কই যাস?’ ছেলেটা ডাক শুনে পলকে দেখতে পেয়ে উজ্জ্বল একটা হাসি হেসে হাত নেড়ে বোঝাল, সে আসছে। এসেই ব্যাগ থেকে একটা ক্যামেরা বের করে দেখাল পলকে। পল ফটোগ্রাফি করত, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, আমাদের চেয়ে খানিকটা সিনিয়র। রাজীব আশরাফের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিল পল। জানলাম, রাজীব চারুকলায় ভাস্কর্য বিভাগে পড়ে। আমরা একই ব্যাচ, ফার্স্ট ইয়ার।

আমিও তখন ফটোগ্রাফি শুরু করেছি। আমাকে ছবি তোলা শিখিয়েছিল পলই। রাজীবকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘ক্যামেরাটা কিনলেন?’ ও বলল, ‘না, এটা আমার গার্লফ্রেন্ডের, আসলে গার্লফ্রেন্ড না, বউই। আমরা বিয়ে করে ফেলছি, ভদ্রতা করে গার্লফ্রেন্ড বলি।’ বলে খুব একগাল হাসল। আমার তো চক্ষু চড়কগাছ! বলে কী এই ছেলে, ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে, বিয়ে করে ফেলেছে! কী সাহস! পরে বুঝেছি, ওটা ওর জন্য এমন কোনো সাহসের কাজ ছিল না। রাজীবের সাহস ছিল আকাশছোঁয়া। নিজের জীবন নিয়ে কোনো রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বাদ রাখেনি। ওর সঙ্গে যখন মিশতে শুরু করি, ওর কাছে সব সময় ইনহেলার থাকত। অ্যাজমার অ্যাটাক হতো প্রায়ই। যাঁদের শ্বাসকষ্ট থাকে, তাঁদের ধুলাবালু থেকে দূরে থাকতে হয়, ধূমপান করতে হয় না আর রোজ গোসল করতে হয়। রাজীব এর কোনোটাই মানত না। না মানার পেছনে ও যেসব যুক্তি দিত, তার কোনোটাই খুব কাজের না, অ্যাবসার্ড সব কথাবার্তা।

কিন্তু ও বলতেই থাকত, বলতেই থাকত! এত কথা বলতে পারত ছেলেটা! একদিন রাজীবকে খুঁজতে ওর বাসায় গেলাম। আন্টি দরজা খুলে বললেন, ‘রাজীব তো বাসায় নাই, কই কই যে থাকে! তুমি তো ওর সাথেই পড়ো, চারুকলাতেই? ও কি ইউনিভার্সিটিতে যায়?’

আমি বললাম, ‘না আন্টি, আমি চারুকলায় না, কলাভবনে পড়ি, কিন্তু চারুকলায় যাই। রাজীব যায় তো ইউনিভার্সিটিতে।’ রাজীবের আশ্রমকে কথাটা আমি বললাম বটে, কিন্তু এটা একটা অর্ধসত্য কথা। রাজীব ইউনিভার্সিটিতে যেত ঠিকই, তবে ক্লাস করত না। কারণ, তার মাথায় ঢুকেছে সিনেমা বানানোর ভূত, তত দিনে ওর প্রথম ছবি ‘জলচর’ বানানোও শেষ। ও সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, আর পড়াশোনা করবে না, সিনেমাই বানাবে।

পরদিন দেখা হলে আমি যখন রেগেমেগে বললাম, ‘তোর জন্য তোর মাকে মিথ্যা বললাম,’ ও তখন

খুব করে হেসে বলল, 'ভালো করছিস, এইটুকু না করলে কিসের বন্ধু!' এরপর বহুবার ওর হাত-পা ধরতে বাকি রেখেছি, পড়াশোনাটা যেন চালিয়ে যায়। ক্লাসটাস করার দরকার নেই, পরীক্ষাগুলো তো দিক, কাজ জমা দিক। তখনো চারুকলা ফ্যাকাল্টি হয়নি, ইনস্টিটিউট ছিল। শিক্ষকেরা চাইলে বিশেষ বিবেচনা করতে পারতেন।

কিন্তু সে জন্য তো শিক্ষকদের কাছে যেতে হবে, বলতে হবে। রাজীব সম্ভবত ছাত্রত্ব ধরে রাখার তেমন কোনো চেষ্টাও করেনি। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ওপর থেকে ওর মন উঠে গেছে, আর পড়বে না, কথা শেষ!

ওইবারও ওর সাহস দেখে আমি মুগ্ধ হই। চারুকলায় পড়ার জন্য সুযোগ পায় না লোকজন, আর ও কিনা ছেড়ে দিচ্ছে! আসলে রাজীবের সবকিছুই ছিল মুগ্ধ হওয়ার মতো। লোককে মুগ্ধ করতে পছন্দও করত ও। শুধু মুগ্ধ নয়, খুশি করতে, আনন্দে রাখতে চাইত সবাইকে। রাজীবকে যাঁরা চেনেন, তাঁদের মধ্যে এমন মানুষ খুব কমই আছেন, যাঁরা রাজীবের নিজের হাতে বানানো কোনো না কোনো উপহার পাননি। আর্ট আর ক্র্যাফট—দুটোই ও করত খেলার মতো করে। ছড়া লেখা, কবিতা লেখা, গান লেখাও ওর কাছে মজার খেলা। ও যেন একটা শিশু, সারাক্ষণ খেলছে! ফেসবুক আসার পর কবিতা লিখত ফেসবুকে। কোনো ব্যাকআপ রাখত না। বারবার বলতাম, প্লিজ লেখাগুলো একত্র করো। কাউকে ই-মেইল করে রাখো।' ও 'করব করছি' করে আর করত না। কোনো এক জুনিয়র বন্ধুকে দায়িত্ব দিয়েছিল, সেখান থেকে কিছু পাওয়া গেছে কি না, জানি না। আমি নিজের ফেসবুকে ২০১০ পর্যন্ত খুঁজে দেখেছি। কোথাও কিছু নেই—না কোনো ছবি, না কোনো লেখা। এখনকার আইডিটা ও পরে খুলেছিল আগেরটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলে। শত শত লেখা, হাজার হাজার শব্দ হারিয়ে গেছে।

এ নিয়ে ওর কোনো আফসোসও ছিল না। শব্দ তো ওর হাতের পুতুল। হারিয়ে গেছে তাতে কী? আবার আসবে, আবার হবে অনেক অনেক লেখা!

আমাকে ও ডাকত প্রেমিকা বলে। বলত, ও আগে থেকে বিবাহিত না হলে নাকি আমার সঙ্গেই ওর প্রেম হতো! এমন মুখে মুখে প্রেম ওর আরও কয়েকজনের সঙ্গে ছিল। এটাও ওর আরেক খেলা। আমাকে নিয়ে অনেক কবিতাও লিখেছিল রাজীব।

কাগজের ওপর কলম দিয়ে মুক্তার মতো গোটা গোটা অক্ষরে লেখা সেসব কবিতাও আমার কাছে আর নেই। শুধু উদ্ধার করতে পেরেছি ওর অ্যাক্রস্টিক কবিতার বিপরীতে ওকে নিয়ে লেখা আমার একটা অ্যাক্রস্টিক—'রাখো সব কাজ ফেলেজীবনের মতো আড়ি হয়ে যাবে বলে দিলাম আজ, ছেলে। আমাদের ছিল, শেষ বর্ষার জলশরীর ছাড়িয়ে মনে মনে চলাচলরাতজাগা নেই, দিনের আলোয় দেখাফসিল প্রেমের অক্ষরে লেখাজোকা।'

আশরাফের 'ফ' বর্ণটি দিয়ে আর কোনো শব্দ কি ছিল না! 'ফসিল' কেন লিখলাম! ওর জন্য ভালোবাসা, প্রেম, স্নেহ, মায়া সব ফসিল হয়ে আমার বুকে আটকে থাকবে বলেই কি? আজীবনের জন্য স্থায়ী হয়ে যাবে বলেই কি? অনেক শব্দ, অনেক অনড় বলেই কি?

একদিন শুনলাম, রাজীবের মা মারা গেছেন। ওদের বাসায় ঢুকতেই মিতুল আপুর সঙ্গে দেখা, ওদের সঙ্গেই ও তখন কাজ করে সম্ভবত। আপু বলল, 'রাজীব কেমন যেন শকড হয়ে আছে, ওর কাছে একটু যা তো!' আমি ওকে খুঁজে বের করলাম, একটা ঘরের একটা পড়ার টেবিল আর খাটের মাঝখানে সংকীর্ণ একটা জায়গায় চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। আমি কাছে গিয়ে গায়ে হাত রাখতেই ও 'মুমু' বলে ডুকরে কেঁদে উঠল। আমি ওকে জড়িয়ে ধরে মাথায় হাত দিয়ে বললাম, 'কাঁদে না'। মিতুল আপু আমাকে বলল, 'ওকে কাঁদতে দে মুমু, একটু কাঁদুক।'



রাজীব মরে গেছে শুনে আমিও কাঁদিনি। যে কয়জন আমাকে ওর মৃত্যুসংবাদ জানানোর জন্য বা সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য ফোন করেছে, সবাই ভেবেছে, আমি একজন শক্ত মানুষ। নইলে বন্ধুর মৃত্যুসংবাদ এত শান্তভাবে কেউ গ্রহণ করতে পারে? তা ছাড়া ২০২১ সালে ফুসফুস অপারেশনের পর কেউই ওর বাঁচার আশা করেনি। সবাই-ই মানসিকভাবে প্রস্তুত, যে কোনোদিন শোনা যাবে, রাজীব আর নেই। আমিও প্রস্তুত ছিলাম।

কিন্তু আসলেই কি ছিলাম? হাসপাতালে দেখতে গিয়ে ওর অমলিন হাসি দেখে আমিও কি ভাবিনি, আরে এটা রাজীব, ও তো পারবেই। যমের সঙ্গে লড়াই করে নিজের জান ফিরিয়ে আনবে ও নিজেই। আমরা বন্ধুরা শুধু পাশে থাকলেই হবে। বাকিটা ও একাই এক শ! শুধু একাই এক শ নয়, ও ছিল হাজারে একজন, না, লাখে একজন! তা-ও নয়, রাজীব আশরাফ আসলে একজনই। যে চলে গেলে পৃথিবীটা অনেকটা খালি হয়ে যায়! ১ সেপ্টেম্বর আমার ঘুম ভেঙে গেল খুব ভোরে। দেখলাম ৫টা ৪৪ বাজে। দুপুরে খাওয়ার দাওয়াত দিয়েছে বন্ধু দম্পতি। বলেছে ঘুম থেকে উঠে চলে যেতে। শুক্রবার, ছুটির দিন, ওরা তো ঘুমাবে একটু। তাই ১১টা নাগাদ বের হব ভেবেছি। এখনো হাতে অনেক সময়।

কিন্তু ঘুম আর এল না। সেদিনই একটা জাতীয় দৈনিকে আমার একটা লেখা প্রকাশিত হওয়ার কথা। অনলাইনে খুঁজে পেলাম, ফেসবুকে শেয়ার করলাম। একটু সকাল হলে বের হয়ে প্রিন্ট পত্রিকাও কিনে আনলাম। তবু সময় তো কাটে না। গান শুনতে শুনতে কী জানি কী ভেবে ‘বাংলা ফাইভ’ ব্যান্ডের ‘আমি লাস্টবেঞ্চ আমি ব্যাকডোর’ গানটা বাজিয়ে দিলাম লুপে। শেয়ার করলাম ফেসবুকেও। লিখলাম, আমি মরে গেলে লাভ বেশি তোর।

রাজীবের লেখা আরও অনেক গানের মতো এই গানও ভীষণ জনপ্রিয়। রাজীব মরে গেলে কার কী হয়, আমি জানি না। আমার মনে হয়, রাজীব মরলে আমার অশৌচ হয়। আমি বা রাজীব কেউই সনাতন নই, আমাদের রক্তের সম্পর্কও নেই।

তবু আমার ইচ্ছা করে, সেলাই ছাড়া সাদা কাপড় পরে মাটিতে শুই, পাতা কুড়িয়ে আগুন জ্বেলে আলোচালের ভাত আর সবজি সেদ্ধ করে ঘি মেখে হবিষ্য খাই, মৌন হয়ে পালন করি শোক। কিন্তু আমি তো মৌন থাকতে পারছি না। সারা দিন সারা রাত থেকে থেকে চিৎকার করে করে কাঁদছি আর কাঁদছি। বন্ধুদের ফোন করে করে কাঁদছি। বোনকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছি, কাঁদছি পোষা কুকুরকে ধরেও।

আমার মতো রাজীবও খুব কুকুর ভালোবাসত। রাস্তায় কুকুর দেখলেই আদর করত! ‘কুত্তার মতো’ ফ্রেইজটা আমি ওর কাছেই শিখেছিলাম। যেকোনো কিছু খুব প্রচণ্ড হলেই ও বলত ‘কুত্তার মতো’। আমার কাছে রাজীবও কুত্তার মতো। অল্প সময় বাঁচল, প্রতিদিন বাঁচল এক-একটা জীবন। সে হিসেবে ওর জীবন মোটেই ছোট নয়। আমরা যারা বুড়ো হয়ে মরব, তাদের চেয়ে অনেক বেশি বড় আর প্রচণ্ড ওর এই অল্প দিনের জীবন। শুধু প্রচণ্ডই নয়, ভীষণ সুন্দরও!

রাজীব ভালোবাসত সৌন্দর্য! ও যা করত, সব সুন্দর হতো! সুন্দর দেখতে দেখতে আর সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে আমাদের প্রচণ্ড মেধাবী আর কান্তিমান বন্ধুটার ছোট্ট জীবনটা শেষ হলো। ওকে না চিনলে পৃথিবীর রং আমার কাছে অনেকটাই কম হতো! কী ভাগ্য আমাদের! রাজীব আশরাফ আমাদের বন্ধু! একটা মাত্র রাজীব আশরাফ!

রাজীব আমাদের মতো জীবন নিয়ে ভণিতা করেনি

লেখা: কৃষ্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়

১ সেপ্টেম্বর মারা গেছেন কবি, গীতিকার, চলচ্চিত্র নির্মাতা রাজীব আশরাফ। ‘হোক কলরব’, ‘প্রকৃত জল’, ‘নাম ছিল না’, রোদ বলেছে হবে’সহ অজস্র জনপ্রিয় গানের গীতিকবি তিনি। তাঁর অকালমৃত্যুর পর গতকাল থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁকে নিয়ে স্মৃতিচারণা করেছেন অনেকেই। রাজীব আশরাফের ঘনিষ্ঠ বন্ধু কবি ও নির্মাতা কৃষ্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়। বন্ধু বিয়োগের বেদনায় কলম ধরেছেন তিনি।

আপনি রাজীব আশরাফকে চেনেন না তো আপনি রাজীব আশরাফকে চেনেন না। কবি, গীতিকার, চলচ্চিত্র নির্মাতা, চিত্রশিল্পী রাজীব আশরাফকে না চিনলেও মানুষ রাজীব আশরাফকে চেনাটা একটা অভিজ্ঞতাই। রাজীব আমার দেখা সেই মানুষ, যে কিনা নিজের জীবনকেই একটা এক্সপেরিমেন্টাল আর্টওয়ার্ক করে তুলেছিল। সেটা করে ও ঠিক করেছিল, না ভুল করেছিল, তা নিয়ে তর্ক থাকতে পারে।

তবে আমি এটুকু বলতে পারি, রাজীব আমাদের মতো জীবন নিয়ে ভণিতা করেনি। মুখে যা বলেছে, তার প্রতিফলন ওর জীবনচর্চায় রেখে গেছে। বয়স ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রতিফলনের ধরন বদলেছে।

আমি রাজীবকে চিনি ২০০০ সাল থেকে। গত ২৩ বছরে রাজীবের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব, একসঙ্গে কাজের সম্পর্ক, নানান আসক্তিতে জড়ানো থেকে শুরু করে মুখ দেখাদেখি বন্ধুর মতো ঝগড়াও হয়েছে আমাদের। মাঝের তিন বছরের যোগাযোগবিচ্ছিন্নতার সময়েও একটা মাসও যায়নি আমি কারও না কারও সঙ্গে রাজীবের সঙ্গে আমার কাটানো সময় নিয়ে গল্প করিনি। সেই গল্প করতে করতে রাজীবের ওপর রাগ হতো আবার ওর প্রতি ভালোবাসাও উপচে পড়ত। যেকোনো সময়, যেকোনো পরিস্থিতি, যেকোনো স্থানকে নিজের অনুকূলে নিয়ে এসে সেখান থেকে জীবনের পূর্ণ রস আন্বাদনের এক অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল আমার বন্ধু রাজীবের। আমরা বেশির ভাগই আমাদের শ্রেণি আরামের বাইরে গিয়ে মানুষকে বুঝতে, জানতে, ভালোবাসতে পারি না। রাজীব জরুরি এই ক্ষমতাটা রপ্ত করেছিল। শিল্পীর জন্য যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে আমার মনে হয়।

আমার মতে, রাজীব আশরাফ ছিল এ দেশে আমাদের প্রজন্মের অন্যতম প্রতিভাবান শিল্পী। আমরা বেশির ভাগই যেখানে চর্চা করতে করতে, পাথরে পাথর ঘষে কোনো কিছু অর্জন করেছি, অর্জনের চেষ্টা করছি, সেখানে রাজীব ভেতর থেকে প্রতিভাবান ছিল।

শয়তানটার সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয় মাস দুয়েক আগে। ফোন দিয়ে বলল, দেখা করবে, অফিসে আসবে। যে সময় তার আসার কথা ছিল, তার এক ঘণ্টা আগে চলে এসেছিল। কাজ শেষ করে আমার আসতে লাগল ৪০ মিনিটের মতো। অপেক্ষা করতে করতে নানান অ্যাঙ্গেলে নিজেই নিজের ছবি তুলে আমাকে ইনবক্স করল। এটা একমাত্র রাজীবের পক্ষেই সম্ভব।

রাজীব হলো আমার জীবনের সেই মানুষ, যাকে একই সঙ্গে সহ্য করা যায় না আবার সহ্য না করেও থাকা সম্ভব না। যার ওপর ভীষণ মেজাজ খারাপ হয়, রাগ হয়, আবার ভালো না বেসে থাকাও সম্ভব হয় না। রাজীবের চলে যাওয়া আমাকে কাঁদাচ্ছে, রাগাচ্ছে, শূন্যতার অনুভূতি দিচ্ছে। গুডবাই মাই ওয়ানস পার্টনার ইন ক্রাইম।

সাহিত্যের আড্ডায় প্রায়ই নতুন ধরনের কবিতা লেখার কথা বলা হয়। কিন্তু পুরোপুরি নতুন বলে কি কিছু আছে? আর নতুনের পরিণতি তো শেষ পর্যন্ত পুরোনো হওয়া। অর্থাৎ বিশ্লেষণের বিষয়, যে কবিতাকে নতুন দাবি করা হচ্ছে, তা কত দিন নতুন থাকবে কিংবা এই নতুনের সঙ্গে পুরোনো কতখানি যুক্ত আছে? পুরোনো হয়ে গেলেই কি কবিতা গুরুত্বহীন? রবীন্দ্রনাথ, নজরুল বা জীবনানন্দ দাশের কবিতাও তো পুরোনো হয়েছে, কিন্তু আজকের পাঠক তো আগ্রহ নিয়ে পড়েন। আজও তো মনে পড়ে ভারতচন্দ্রের স্মরণীয় কিছু চরণ, ‘নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়’ বা ‘আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে’। আসলে কবির কাজ সমসাময়িক ভাষা ও শব্দভান্ডারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন, সমকালীন অভিজ্ঞতা আর চিরন্তন অনুভূতিকে সঙ্গী করে কবিতাকে আপডেটকরণ। এই আপডেটকরণকেই বলা হয় নতুন কিছু করা। এক্ষেত্রে চিন্তার গভীরতা আর অভিনবত্বই হয়তো একজন কবিকে অন্য কবি থেকে এগিয়ে রাখে!

অভিযোগ শোনা যায়, এ সময়ের কবিদের কবিতা পাঠকদের কোনোভাবেই আকৃষ্ট করতে পারছে না। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, আজকের কবিতার পাঠকদের ৫০ শতাংশ লেখালেখিতে জড়িত (বিশেষত নবীন ও তরুণ), ৪০ শতাংশ কবির আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব এবং ১০ শতাংশ সাধারণ পাঠক।

এমন অভিযোগ ও পরিসংখ্যান সামনে রেখেই বলা যায়, ভার্চুয়াল দুনিয়ায় রোজই লিখিত ও পঠিত হচ্ছে অসংখ্য কবিতা, বেড়েছে কবিতার বই প্রকাশের সংখ্যাও। এর মধ্যে হয়তো থেকে যাচ্ছে উৎকৃষ্ট কোনো কোনো কবিতা। মার্কিন কবি ডব্লিউ এইচ মারউইনকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কবিতাকে কীভাবে জনপ্রিয় করা যায়? তিনি বলেছিলেন, শব্দ করে করে কবিতা পাঠের মাধ্যমে। একই রকমে প্রতিধ্বনি যেন পাওয়া যায় হোর্হে লুইস বোর্হেসের কথাতেও, সত্যিকারের ভালো কবিতা পড়তে হবে সশব্দে। ভালো কবিতা নীরবে পঠিত হতে চায় না। যদি নীরবে পড়ি, তবে তা কবিতা নয়। কবিতা উচ্চারণ দাবি করে। মনে রাখতে হবে, কবিতা প্রথমে মৌখিক শিল্প, তারপর লিখিত।

বোর্হেসের কথা আমাকে ভাবায়। লক্ষ করেছি, কবিতায় ব্যবহৃত শব্দ-ছন্দ-বক্তব্য বা ধ্বনির শক্তি জোরে জোরে পাঠ করলে যেভাবে টের পাওয়া যায়, মনে মনে পাঠে সব সময় পাওয়া যায় না। ছাপাখানা আবিষ্কারের আগপর্যন্ত কবিতা তো ছিল শোনারই বিষয়। পৃথিবীর অনেক জায়গাতেই তখন কবিতা ড্রাম বাজিয়ে পাঠ করা হতো। তবে কবিতা আর কেবল শ্রুতিনির্ভর নেই, দেখার বিষয়ও হয়ে গেছে। কবিতায় যে স্পেসের ব্যবহার, কবিতার যে বিভিন্ন রকমের আঙ্গিক, তা ছাপাখানারই অবদান। ছাপাখানা কবিতাকে দেখারও বিষয় করে তুলেছে, মনে মনে পাঠের বিষয় করে তুলেছে। কবিতা বিচিত্র নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে অনেক দূর এগিয়েছে।

নতুন সময়ে লেখা উৎকৃষ্ট কবিতা উপলব্ধির জন্য পাঠককেও নিশ্চয় যথাযথ আপডেট হতে হবে, তা না হলে তিনি সমকালীন কাব্যরস উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত থাকবেন। এর দায় কোনোভাবেই কবির নয়!

36.....

কবিতার পাঠক বেড়েছে  
হাসান হাফিজ

কবিতার পাঠক আজকাল কি কমে গেছে নাকি বেড়েছে? পাঠক যদি কমে যায়, তাহলে কেন কমেছে? কবিতার বই কী রকম বিক্রি হয়? কবিতাজগতে সম্পৃক্ত থাকার কারণে প্রায়ই এসব প্রশ্নের মুখোমুখি হই। এককথায় কোনো প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। কোনো নির্ভরযোগ্য জরিপ যেহেতু নেই, সুতরাং প্রকৃত চিত্র পাব না। উত্তরের জন্য নির্ভর করতে হবে পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা, অনুমান, পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুধাবনের ওপর।

বিশ্বনন্দিত সংগীতজ্ঞ পণ্ডিত রবিশঙ্করের সাক্ষাৎকার নেওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল—দু-দুবার। একবার তিনি বলেছিলেন, ‘উচ্চাঙ্গসংগীত খুব সাধারণ মানুষও সহজেই বুঝবেন, এমন আশা করাটা সংগত নয়। নিজে কে শ্রোতা হিসেবে তৈরি করতে হবে আগে।’ কবিতাও যেহেতু শুদ্ধতম শিল্প, সে কারণে এর মর্ম বুঝতে পাঠককে কিছুটা তৈরি তো হতে হবেই। গদ্যে তেমন কোনো রহস্যভাস উপস্থিত নেই, যা আছে কবিতার লাবণ্যমাখা শরীরে-মনে। একেক পাঠে একেক প্রকার ব্যঞ্জনার স্বাদ পাওয়া যায় কবিতার। যেন এক নান্দনিক চিত্রকর্ম। আধখানা পাই তার, আধেক হারাই। আলো-আঁধারির শিহরণ, মাদকতায় মুগ্ধ হই। কবিতা বেদনার উপশম। গল্প-উপন্যাসের তুলনায় কবিতার পাঠক চিরকালই কম ছিল। হয়তো তা-ই থাকবে।

তবে আমার মনে হয়, ইদানীং কবিতার পাঠক বেড়েছে। প্রিন্ট মাধ্যম থেকে একালের মানুষ খানিকটা দূরবর্তী, ডিজিটালেই এখন যেন তাঁদের বেশি স্বাচ্ছন্দ্য এবং তাঁরা মুঠোফোনের ওপর পুরো নির্ভরশীল। তাই কবিতাও এখন ভালোমতো ঠাই নিয়েছে নেট দুনিয়ায়, মেটা পৃথিবীতে। নতুন নতুন পাঠকও সৃষ্টি হচ্ছে, সন্দেহ নেই। আদতে পাঠকের কাছে পৌঁছানোর মাধ্যমটা একেবারেই পাল্টে গেছে। আমূল সে পরিবর্তন। অত্যাধুনিক ডিভাইস আমাদের প্রায় সবার হাতের নাগালে, কবিতাও পেয়েছে নতুন ঘরবসতি। তবে কথা কি, ডিজিটাল মাধ্যমে যেসব কবিতা পাচ্ছি, সেসব কবিতাকে যেমন হৃদয়ছোঁয়া হতে হচ্ছে, তেমনি হতে হচ্ছে অতি অবশ্যই সংক্ষিপ্ত। কারণ, অনলাইন বা ডিজিটালে দীর্ঘ লেখা পড়ার সময় বা ইচ্ছা মানুষের অতটা নেই।

আর ছাপা বইয়ের পাঠক কমেছে, সেটা নির্মম সত্য। আবার এ কথাও ঠিক, বই পাঠকের কাছে সহজে পৌঁছানো এখনো অবধি নিশ্চিত করা যায়নি।

কবিতা ও গান একে অন্যের পরিপূরক। কবিতা প্রশান্তির উৎস। চিন্তাকে উসকে দেয়। ভালো লাগায় মন ভরিয়ে দিতে পারে। কবিতার অদভুত এক সম্মোহনী ক্ষমতা আছে, যা গদ্যের নেই। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সার্থক কথাশিল্পী ও কবি—দুটোই ছিলেন। সুনীলদার একটা কথা এ ব্যাপারে বেশ প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেছিলেন, ‘গদ্য লিখতে পারলে ভারমুক্ত হই, কবিতা লিখে পাই আনন্দ।’

37.....

কবিতার পাঠক কি কমে যাচ্ছে  
টোকন ঠাকুর

এখন মহাকালের যুগ নয়, মুহূর্তের যুগ। প্রযুক্তির বৈপ্লবিক পরিবর্তনের এই অন্তর্জালিক যুগে

কবিতার পাঠক কি কমে যাচ্ছে?

কবিতা মাতৃভাষার জাত ফসল। ভাষা কবিতায় সংকেত আকারে ব্যবহৃত হয়। শব্দ-বাক্যে কিছু চিত্রিত হয় বটে, কিন্তু কবিতা অবস্থান করে লিখিত শব্দ-বাক্যের শরীরের বাইরেই। যেনবা গোপন মন্ত্র, যা পঠিত হচ্ছে অভিব্যক্তি তার থেকে ঢের বেশি। কথার কথা, একটি কবিতা হয়তো একটা এক হাজার টাকার নোট, যার মধ্যে অসংখ্য আলাদা আলাদা নোট লুকিয়ে আছে। তারপরও সাধারণ শিক্ষিত লোকের ভিড়ে কবিতার পাঠক অনেক কম—হয়তো সব দেশে, সব কালে, সব ভাষাতেই কম। গল্প বা উপন্যাস পড়তে পারেন বা পড়ে থাকেন, এমন পাঠকেরও কবিতা পাঠের প্রস্তুতি না-ও থাকতে পারে। আর কবিতার পাঠক আরেকটু নির্বাচিত, আরও একটু গভীরতর পাঠক। সে কারণে কবিতার বইয়ের বিকিকিনিও সাহিত্যের অন্যান্য শাখার চেয়ে কম। তবে অনেকে বলেন, কবিতা সেই 'নির্বাচিত পাঠক'-এর কাছ থেকে গড়পড়তা পাঠকের কাছে যাওয়া 'টেক্সট' হয়ে উঠলে সেই লেখায় 'কবিতা' অনুপস্থিত হয়ে যেতে পারে বৈকি! সে ক্ষেত্রে ব্যাপক পাঠকের বোধগম্যতায় না পৌঁছানো কবিতার জন্যই মঙ্গল—এমন মতও প্রতিষ্ঠিত। চর্যাপদ-এ কুক্কুরীপাদ রচিত পুরোনো একটি কবিতা থেকেই উদ্ধৃত করি, 'কোড়ি মাঝে একু িহঅহি সমাইল', যার অর্থ—এমন বাক্য রচিবে, যেন কোটিতে একজনের বেশি না বোঝে।

বলা হয়, কবিতার দেশ, ভাবের দেশ বাংলাদেশ। যদিও কবিতা ঠিক কাকে বলে, কবিতার সংজ্ঞা কী—তা আমরা কেউই জানি না। কিন্তু পড়তে পড়তে অনুভব করি, হ্যাঁ, এটি একটি কবিতা; অর্থাৎ অনুভবের একটা বড় দায়িত্ব আছে কবিতা আত্মদানে। কবিতা সেই দায়িত্ব নিয়েই পাঠকের সামনে হাজির হতে চায়। বুদ্ধিবৃত্তিক রচনাভঙ্গির চেয়ে অনুভববৃত্তিই মুখ্য হয়ে রস সঞ্চার করে পাঠে, পাঠকের মনে। কয়েকটি বাক্যেই এত কথা কীভাবে আত্মগোপন করে থাকে কবিতায়, সেই বিস্ময় কবিতা ছাড়া অন্য 'টেক্সট'-এ কতটাই-বা পাওয়া যায় আর! একজন চিকিৎসক কয়েকটি নাম-তথ্য লিখে দেন প্রেসক্রিপশনে, রোগী সেই অনুযায়ী ওষুধ কিনে খেতে খেতে সুস্থ হয়ে যান। সংগত কারণেই চিকিৎসকের লিখে দেওয়া প্রেসক্রিপশন শুধু কয়েকটি নাম-তথ্য নয়; বরং তার চেয়ে বেশি কিছু—এ তো আমরা জানি। কবিতাও কবির লিখে যাওয়া কয়েকটি বাক্যের বেশি কিছু, সে কথা অবশ্য খুব বেশি লোক জানেন বলে মনে হয় না। তাই কবিতাপাঠ থেকে রস নিতে পারার ক্ষমতা পাঠকের থাকতেই হবে। যাঁর নেই, তিনি আর যা-ই হোন, কবিতা-পাঠক হবেন না। এতে অবশ্য দোষ নেই কিছুই, কিন্তু গুণ কম আছে। তরকারিতে নুন কম থাকার মতো গুণ কম থাকা পাঠকের জন্য কবিতা নয়। এতে আবার হাপিত্যেশেরও কিছু নেই। এটি একটি স্বাভাবিক মাত্রা। সব সময়ই এমন আলোচনা-শিক্ষা চালু থাকে যে কবিতার পাঠক কি কমে যাচ্ছে? কবিতা কি পাঠক বুঝতে পারছেন না? কবিতা কি পাঠকের চাহিদা পূরণ করতে অক্ষম হয়ে পড়ছে? কিংবা যন্ত্রযুগের আরও বিস্তৃতিতে কবিতার পাঠক-গ্রাহক কি আরও কমে যাবে? কবিতা কি পাড়াগাঁর নদীটির মতো মরে যাবে? কবিতা মরে গেলে কবির কথা কি আমাদের মনে থাকবে আর?

আদতে সব সময়ই কবিতার বইয়ের কাঁটটি কম। কবিতার পাঠক কম। আমি মনে করি, এতে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। কোনো আর্ট তথা শিল্পকলার কোনো কলাই যেমন সব ধরনের গ্রাহকের জন্য নয়, সব খাদ্যও ঢালাওভাবে সব মানুষ একই রকম পছন্দ করে না। এতে কিন্তু সেই খাদ্যের সংকট প্রমাণিত হয় না। স্বাদবৈচিত্র্যের ভিন্নতা আছে, পাঠবৈচিত্র্যের ভিন্নতাও থাকবে। যার যার সাধ ও সাধ্য, রুচি ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী তার তার মধ্যে গ্রহণ-ক্ষমতা নিহিত; অন্য কথায় বলতে পারি, ক্ষমতা অনুযায়ী তা বিদ্যমান থাকে, সেই অনুযায়ী মানুষ খাদ্য খায়, পোশাক পরে, চলাফেরা করে। পাঠক হিসেবেও ক্ষমতা অনুযায়ী মানুষ তার গ্রহণীয়তার দিকে যাবে। আর গড়পড়তা কবিতার

গতিপ্রকৃতি নিয়েও কথা বলায় গলদ থাকে বিস্তর। কবি বলতে কি একই সময়ের সব কবিকেই একাকার করে দেখব আমরা? সব কবিতাকেই কি সমান ‘মূল্য’ দিয়ে আমরা দেখতে পারি? কাজেই কবিতার পাঠক এখন আগের তুলনায় কমে যাচ্ছে—এ কথা একবাক্যে বলা যাবে না। ধরা যাক, গত শতাব্দীর ষাটের দশকের সমাপ্তির দিকে আবুল হাসান বা নির্মলেন্দু গুণ কবিতা লিখতে শুরু করেন, সেই সময়ের বাস্তবতায় আরও যাঁরা লিখতেন বা কমবেশি লিখেছেন, যেমন মুস্তফা আনোয়ার বা নূরুল হক—তাঁরা সবাই তো একই সময়ের কবি। পাঠক কি তাঁদের সবাইকেই সমানভাবে গ্রহণ করেন? ফলে পাঠকেরও শ্রেণি বা পৃথক্করণ না করলে এই আলোচনার কোনো গন্তব্য থাকবে না। এখন যদি বলি, ষাটের দশকে বাংলা কবিতায় জোয়ার বয়ে গেছে। সেই জোয়ারে আবুল হাসান, নির্মলেন্দু গুণ, নূরুল হক বা মুস্তফা আনোয়ারসহ সবাই একই রকমভাবে পৌঁছেছেন পাঠকের কাছে, ঠিক বলা হবে?

আগেই প্রশ্ন রেখেছিলাম, ‘পাঠক’ শ্রেণির আড়ালে কি সবাই একই ওজনের রস আত্মদানকারী? কোনো পাঠক বলতে পারেন, আবুল হাসানের কবিতায় মজা বেশি, নির্মলেন্দু গুণ অনেকটাই স্টেটমেন্ট লিখেছেন। স্টেটমেন্ট কতটুকু কবিতা আর কতটুকু—ই বা ‘কবিতার মতো’? কোনো পাঠক আবার স্টেটমেন্টকেই বলতে পারেন ভালো কবিতা—সেই স্বাধীনতা তাঁর শতভাগ আছে। কোনো পাঠক হয়তো বলবেন, ‘আমি হয়তো মানুষ নই, মানুষগুলো অন্য রকম’—এর কমতি কোথায়? সেই সময়ের বাস্তবতায় ‘হুলিয়া’ কি কম প্রভাববিস্তারি কবিতা? ‘হুলিয়া’ কি শুধু স্টেটমেন্ট? তবু মুস্তফা আনোয়ার বা নূরুল হকও যতটুকু পৌঁছেছেন পাঠকের কাছে, পৌঁছাতেই পারেননি; কিন্তু লিখে গেলেন, এলাকার কবি হিসেবে কোথাও কারও যে অবস্থান, তার মূল্যায়ন কীভাবে হবে? কাজেই একবাক্যে যেমন বলা যাবে না সব কবিই এক কবি নন, তেমনি সব পাঠকও এক পাঠক নন। তাই গড়পড়তা বলা কি সংগত হবে, আগে কবিতার পাঠক বেশি ছিল, এখন কম? তবে হ্যাঁ, কিছু বিষয় আমাদের সামনে এমন জলজ্যাগন্তভাবে হাঁ করে আছে যে তার থেকে আমরা কিছু নির্ণয় করার চেষ্টা করে দেখতে পারি। তাকাতো পারি আমাদের সমাজ—ইতিহাসের দিকে। গত শতাব্দীর ষাটের দশকে ভৌগোলিকভাবে আমরা স্বাধীন ছিলাম না, জাতীয়তাবাদ আমাদের কাছে তখন আকর্ষণীয় কিছু তো ছিলই, তাই কবিতারও একটা প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক ব্যবহার হয়েছে সে সময়। তখন টেলিভিশন ছিল না, পত্রপত্রিকাও ছিল কম, সামাজিক বিনোদনের জানালা—দরজা দিয়ে কি আর এমন ঢুকতে পারত! গত শতকের আশির দশকেও, তখন তো মানুষের কাছে আজকের মতো এত সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম—ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার এবং ইন্টারনেট আসেনি। সেই সময়ে কবিতার রাজনৈতিক ব্যবহার ও প্রভাব আমরা দেখেছি। রাজাকে কটাক্ষ করে কবি কবিতা লিখলেন। রাজার হুলিয়া মাথায় নিয়ে তিনি পালাতে চাইলেন। রাজার লোকেরা কবিকে ধরে আনল সমুদ্রতীরের জেলেপল্লি থেকে। দিনে দিনে রাজার বিরুদ্ধে কবিতার প্রতিবাদী সংগঠন গড়ে উঠল। রাজার বিরুদ্ধে প্রচুর কবিতা লেখা হলো। হয়তো সেগুলো বেশির ভাগই নিচুমানের রচনা। কিন্তু এই ‘নিচুমান’ বলার আমি কে? হ্যাঁ, পাঠক হিসেবে আমি হয়তো এটা বলছি, কিন্তু কে বলবে, এই মন্তব্য একধরনের পাণ্ডিত্য জাহিরি? এবং আশ্চর্য ব্যাপার, সেই রাজা নিজেও কবিতা লিখতেন। রাজা অবশ্য ‘দেশ’, ‘বন্যা’, ‘মানুষের পাশে এসে’ কিংবা পয়লা বোশেখে বৈশাখী কবিতা আর ফেব্রুয়ারিতে ‘মাতৃভাষা বাংলা বাংলা’ বলে কবিতা লিখেছেন। রাজা লিখেছেন, ‘কনক প্রদীপ জ্বালো’। সেই কাব্য নানান ভাষায় অনূদিত হয়। রাজার বিপক্ষে দাঁড়ানো কবিদের সেই সংঘ পরে অবশ্য অন্য রাজার দরবারে আতিথেয়তায় বুঁদ হয়ে দীর্ঘকালের জন্য ঘুমিয়ে পড়ে। তাহলে এ প্রশ্ন তোলাই যায়, আশির দশকের সেই কবিতাগুলো তখন সামাজিক-রাজনৈতিক একটা

জনপ্রিয়তা বা পরিচিতি পেয়ে গেলেও টিকে আর থাকল কি? বাংলা কবিতার দার্শনিক ভ্রমণে এসব কবিতা কোনো প্রভাব রাখতে পারল?

চারধারে এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম তথা সোশ্যাল মিডিয়ার দাপট। পরিস্থিতি আগের চেয়ে দারুণভাবে আলাদা। আগে একটি কবিতা ছাপানোর জন্য সাহিত্য সম্পাদকের বিবেচনা বা কখনো কখনো অনুকম্পা পেতে হতো। নইলে দলগতভাবে অত্যন্ত শ্লাঘার সঙ্গে লিটল ম্যাগাজিন-প্রচেষ্টা ছিল। এখন ইন্টারনেট এসে সে ভূগোল পাল্টে গেছে। দিন দিন অনেক বেশি ক্ষমতালী হয়ে উঠছে গুগল। পাবলিক লাইব্রেরিতে গিয়ে বসে বসে পড়ার দিন প্রায় শেষ হতে চলেছে। এমনকি প্রচলিত গণমাধ্যমের ক্ষমতা অনলাইন মিডিয়ার কাছে ক্রমে বাসি হয়ে উঠছে। গ্রাহকের হাতের ফোনেই তাঁরা পেয়ে যাচ্ছেন সব। প্রিন্ট মিডিয়ার কবিও অনলাইন মিডিয়ায় তাঁর বইয়ের খবর ছাপাচ্ছেন মনের আনন্দে। বাস্তবতা যখন এই, তখন ফেসবুক বা বিভিন্ন ওয়েব ম্যাগাজিন আর ব্লগে বিস্তর কবিতা প্রকাশিত হচ্ছে। তবে সেগুলো সবই কি কবিতা? ভালো কবিতা? নাকি মনের ভাব প্রকাশমাত্র? এ রকম বিতর্ক চালু থাকবেই। তবু অনলাইনে প্রকাশিত লেখা দিয়েই ফি বছর বইমেলায় বই প্রকাশিত হচ্ছে। পাঠক দেদার কিনছেন। আবার সেই পাঠক? কবিতার পাঠকও প্রায় কবি, হয়তো তাঁর শুধু লেখাই হয় না। লেখা একটা অনুশীলন, সেই অনুশীলন সবার থাকে না, সবার সমানভাবে থাকে না। তাই যাঁর যাঁর অনুভব প্রকাশ হয় যাঁর যাঁর বাক্যবন্ধনীতে। হয়তো একেই আমরা বলি কণ্ঠস্বর। একেকজন মানুষের কণ্ঠস্বরের মতো একেকজন কবির কণ্ঠস্বরও পৃথক হতে থাকে। যে কারণে ১৮৯৯ সালে জন্ম নেওয়া দুজন বাঙালি কবি—একজনের নাম কাজী নজরুল ইসলাম, আরেকজন জীবনানন্দ দাশ—কী দারুণভাবেই না তাঁদের কবিতার কণ্ঠস্বর আলাদা রকমের! দুই কবিরই পাঠক অনেক, প্রজন্মের পরে প্রজন্ম ধরে তাঁরা পঠিত হচ্ছেন। কেউ কেউ বলেন, মহাকাল তাঁদের কোলে টেনে নিয়েছে।

এখন মহাকালের যুগ নয়, মুহূর্তের যুগ। মুহূর্ত লিখে পাশে মহাকাল লেখা যায়? হা হতোস্মি! এই সময়ে মানুষ তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া পেতে চায়। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া পাওয়ার ব্যবস্থা এসে গেছে প্রযুক্তির বৈপ্লবিক বিকাশ ঘটার কারণে। এখন আর মহাকাল মনে রাখবে বলে বিদ্যমান কোনো পরিস্থিতি লক্ষণীয় নয়। খুব নামডাকঅলা কোনো কবি মারা গেলে ফেসবুকের নিউজফিডে কবির ছবি ঘুরবে দুই দিন। তিন দিনের মাথায় অন্য কারও ছবি চলে আসবে। কারণ, বিখ্যাত ব্যক্তিদের মৃত্যুও তো চলতেই থাকবে। আর সেই কবির সঙ্গে তোলা ছবি থাকলে—এখন তো প্রায় থাকেই—ওই ছবি আপলোড দেবেন পাঠক। তাৎক্ষণিকভাবেই পাঠকের পছন্দ, ভালোবাসার কথা জানা যাবে। মন্তব্যও জানিয়ে দিতে পারবেন সবাই। আগের চেয়ে এখনকার এই ব্যাপকতর পরিবর্তনের ফলে এ মন্তব্যও একবাক্যে করা কঠিন যে কবিতার পাঠক কি ক্রমে কমে যাচ্ছে বা আগের তুলনায় হ্রাস পাচ্ছে? জীবনযাপনের ফাঁকে নিজের জন্য পাওয়া সময় খরচ করার মাধ্যম এখন অনেক। এতে কবিতার সেই দাপুটে প্রভাব কিছুটা তো খর্ব হয়েছেই। কবিতার বাইরে অনেক রসতৃপ্ত উপাদান যদি থাকে, সেই 'নির্বাচিত পাঠকের একজন' হয়ে ওঠার সাধন-কসরত কেন কেউ করতে যাবে? কেউ কেউ যাবেই। যেমন সবাই কবি নয়, 'কেউ কেউ কবি।'

আজ ২৪ আগস্ট আর্জেন্টিনার কালজয়ী লেখক হোর্হে লুইস বোর্হেসের জন্মদিন। তিনি ছিলেন একাধারে কবি ও ছোটগল্পকার। তবে লকডাউনের সময়ে লেখা এই রচনায় সাংবাদিক ক্রিস মস কবি হিসেবেই বোর্হেসকে বেশি চিহ্নিত করেছেন। কেননা, আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনস এইরেস, যাকে দক্ষিণ আমেরিকার নাকি 'সবচেয়ে ইউরোপীয় শহর' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, সেই শহরের রাস্তাঘাট নিয়ে বোর্হেসের কবিতাগুলোই তাঁকে বেশি টেনেছে। তাঁর কবিতার সূত্র ধরে বুয়েনস এইরেসের রাস্তায় একসময় বোর্হেসের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়ে নতুন এক জগতে প্রবেশ করেছেন ক্রিস মস। এখানে আছে লেখকের কাছে বোর্হেস ছিলেন এক জলজ্যন্ত সেলিব্রেটি, যাঁর ছবি বা পোস্টার রাস্তাঘাটে দেখে তাঁর কাছে মনে হয়েছে, তিনি একজন নায়ক। 'গার্ডিয়ান' পত্রিকায় এই লেখা প্রকাশিত হয়েছিল ২০২০ সালের ২৪ মে। বোর্হেসের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত লেখাটি অনুবাদ করেছিলেন তৌকির হোসেন। লেখাটি আবার প্রকাশিত হলো।

লকডাউন আমাকে নস্টালজিক করে তুলেছে। এই নস্টালজিয়া যতটা না ভ্রমণের দিনগুলো নিয়ে, তারচেয়ে বেশি ভ্রমণের স্থানগুলো নিয়ে। এটা আশ্চর্যের কিছু নয়, যখন সেই স্থানগুলোর মধ্যে থেকে আমার প্রিয়, অল্পমধুর স্মৃতিবিজড়িত রাজধানীর নাম মাথায় আসে—বুয়েনস এইরেস। এই নাম মাথায় আসার পেছনে কারণ অনেক, আর তা ব্যাখ্যা করা একটু জটিল। বুয়েনস এইরেসের অধিবাসীদের বলা হয়ে থাকে পোর্তেনোস। শহরের অধিবাসীদের এই নাম দেওয়া হয়েছিল এমন একটা সময়ে, যখনো প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উত্তাপ ও অভিশাপ এই অঞ্চলে এসে লাগেনি, যখন আর্জেন্টিনা ছিল সম্পদশালী ও সম্ভাবনাময় এবং কল্পনা করা হতো এই অধিবাসীরা সুদূর স্পেন বা ইতালি থেকে এসে এখানে বসবাস করা শুরু করেছে। ট্যাঙ্ককে ভাবা হতো প্রেমময় ও রহস্যময় কিছু।

আমি সেখানে প্রায় এক যুগের মতো বসবাস করেছি এবং পরবর্তী দুই যুগে প্রতিবছর সেখানে বারবার ফিরে গিয়েছি। এই বারবার ফিরে যাওয়া, হয়তো নস্টালজিয়ার ধার একটু হলেও কমিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, আর্জেন্টাইন রাজধানীর পথেপ্রান্তরে হাঁটাহাঁটি করা, এলোমেলো ঘুরে বেড়ানো, যেকোনো কিছুর চেয়ে আমি খুব বেশি মিস করি। আর এখন, এই আধা গ্রামীণ ইংরেজ ঘরে, আমার মানুষের কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে জনমানুষের সমাগম আর তাদের ভিড়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলার মুহূর্ত।

আমি বুয়েনস এইরেসের প্রতিটি রাস্তায় হাঁটার চেষ্টা করেছি। জানি, এটা বোকার মতো শোনায়। একজন স্থানীয় লেখকের মতে, বুয়েনস এইরেসে ২ হাজার ১৫৪ টির মতো রাস্তা রয়েছে এবং সেগুলো মিলে কয়েক হাজার মাইলের মতো দূরত্ব তৈরি করে। কিন্তু একজন বিদেশি যদি কোনো শহরকে আপন করে নিতে চায়, তাহলে তার জন্য সেখানে হাঁটা ছাড়া তো আর কোনো গতি নেই। প্রথম যখন আমি লুমি গাইডবুক (রাজধানীর রাস্তাঘাটের মানচিত্র) কিনলাম, সেই মানচিত্রে শত শত রাস্তার ছক আর হিজিবিজি দেখে বেশ একটা ধাক্কা খেয়েছিলাম। মানচিত্রে ইংল্যান্ড যেমন মধ্যযুগের দস্ত নিয়ে, সুপরিকল্পিত রাস্তাঘাটের নকশা নিয়ে সাজানো-গোছানো দেশ হয়ে ভাব ধরে থাকে, আর্জেন্টিনার বুয়েনস এইরেস সেখানে প্রথম দেখায় ছিল একটা ধাঁধার মতো।

ক্রমেই আমি কেন্দ্র থেকে হেঁটে হেঁটে দূরে সরতে থাকি, শহরের সবচেয়ে লম্বা রাস্তা, ২৩ মাইলজুড়ে আভেনিদা রিভাদাভিয়া পার হই, উত্তরের শ্রমিকদের এলাকা সাভেদ্রার দিকে মোড় নিই, পরে দক্ষিণের এল সারের দিকে আগাতে থাকি, যেখানে ট্যাঙ্কের কথা এখনো শোনা যায়, যে এলাকাকে মলিন মনে হয়, যেন সে জায়গাটা অসম্পূর্ণ কোনো এক দিকে। জনমুখে একটা কথা



চালু আছে, এই শহর দক্ষিণ আমেরিকার নাকি 'সবচেয়ে ইউরোপীয় শহর'। ঘুরেফিরে সেই কথার দিকেই মন চলে যায়। আমার চোখের সামনে ফুটে ওঠে এক লাতিন আমেরিকান বাস্তবতা: কিছু জায়গায় ঘিঞ্জি, সারি সারি টিনের পুরোনো বাড়ি, কিছু জায়গায় আবার কাচঘেরা বারান্দার শৌখিন আবাস এবং তাদের ওপরে মাথা উঁচু করে থাকা আমেরিকান আধুনিক অট্টালিকা। এই নতুন-পুরোনো, মলিন-অমলিন, সুন্দর-অসুন্দরের পাশাপাশি নির্লিপ্তের মতো দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যেও একধরনের মোহ কাজ করে।

শহরের গাইড বই আমার কল্পনার রস জোগাতে পারে না। আমার বরং স্থানীয় কাউকে দরকার হয়, যিনি আমাকে এই নগরীর ধাঁধার জট খোলার রাস্তাটা দেখাবেন। আমি এমন একজনকে পেয়েও যাই, যাকে কিনা আর্জেন্টিনার বাইরে রহস্য ও হেঁয়ালির গুরু মানা হয়।

হোর্হে লুইস বোর্হেসের সান্নিধ্যে আমি প্রথম আসি টিনএজ বয়সে, তাঁর 'দ্য বুক অব ইমাজিনারি বিয়িংস' বইয়ের কল্যাণে। শুধু সাহিত্যগোষ্ঠীগুলোর মধ্যেই নয়, বরং বলা চলে এইরেসের প্রায় সর্বত্র বোর্হেসের নাম প্রায়ই উচ্চারিত হয়। এমিসি প্রকাশনী থেকে বের হওয়া বোর্হেসের রচনাসমগ্র দৃষ্টিভঙ্গীতে শহরের বইয়ের দোকানগুলোয় 'আর্জেন্টাইন সাহিত্য' সেকশনে একেবারে চোখে পড়ার মতো জায়গায় গর্বভরে দাঁড়িয়ে থাকে। পত্রপত্রিকায় তাঁর ছবি এখনো হরদম দেখা যায় সময়ে-অসময়ে। শহরের শপিং সেন্টারের একটা কোনায় তাঁর নামযুক্ত শিল্পকেন্দ্র প্রতিদিন অপেক্ষা করে দর্শনার্থীর জন্য।

বোর্হেস অবশ্য তাঁর ছোটগল্পের জন্যই সবচেয়ে পরিচিত। কিন্তু তাঁর কবিতাই বরং আমার এইরেসে যাপনে ছন্দ জোগায়। নিদেনপক্ষে তাঁর কবিতা, সেখানকার চারপাশের আবহে যে অন্তরীণ জটিলতা রয়েছে, তা বুঝতে আমাকে সাহায্য করে। তাঁর 'দ্য স্ট্রিটস' কবিতার শুরুর লাইনের কথা মনে পড়ে যায়। কবিতাটা বেরিয়েছিল ১৯২৩ সালের প্রথম কবিতাসংগ্রহে, বুয়েনস এইরেসে তখন বেশ গরম পড়ছে। লাইনটা এমন, 'আমার আত্মা এই রাস্তায়/এই বুয়েনস এইরেসে'। এই কবিতা বলে, কীভাবে বোর্হেস নিজেকে শুধু শহরের কেন্দ্রের সঙ্গেই নয়, বরং 'প্রতিবেশী ঘটনাহীন রাস্তাগুলোরও একই সঙ্গে চেনান, খুঁজে পান'।

আরবিজাত শব্দ ব্যবহার করতেন বোর্হেস, যা থেকে মনে পড়ে যায় আন্দালুসিয়ার কথা। বোর্হেসের চোখ দিয়ে আমি দেখি একটা পুরোনো পৃথিবী কীভাবে আবার নতুন হয়ে ধরা দিচ্ছে। 'এল পাসিও' নামের এক কবিতায় কীভাবে একটা মামুলি আঙিনা হয়ে যাচ্ছে 'বেহেশতে প্রবাহিত হয়ে চলা নদী, যার ঢাল দিয়ে আসমান বাড়ির ভেতরে হানা দেয়'। বোর্হেস সিরিয়াস ধরনের এক পথিক ছিলেন, যাঁর মহাকাব্যিক পরিভ্রমণের আখ্যান শুনে মনে হয় আধুনিক কোনো এক মনোভূগোলবিদের কথা শুনছি। তিনি লিখছেন, কাবালিতো, পম্পাই ও অর্জুজার ভিলার মতো পর্যটকমুক্ত মফস্বল এলাকার 'সাধারণ' এই মেটে বাদামি রঙা বাড়ি, ঐক্যবৈক্যে ওপরে উঠে যাওয়া সিঁড়ি, কলবেলের আওয়াজ, সন্ধ্যার ধূসর আলোয় মনে হয় 'কবিতার মতোই রঙিন, আলোকিত'। একেবারে সাধারণ রাস্তাগুলোও বোর্হেসের কাছে হয়ে ওঠে কবিতার মতো মহান আর উদার।

বোর্হেসের দ্বিতীয় কবিতাসংগ্রহের নাম 'মুন অ্যাক্রস দ্য ওয়ে' (১৯২৫), যার মাধ্যমে তিনি ধরতে চেয়েছেন এইরেসের ক্রমে পশ্চিম দিকে বিস্তৃত হওয়ার কাব্যিক নিশান। তখন রিভার প্লেট নদীর মোহনা পেরিয়ে এইরেস এগিয়ে যাচ্ছে আরও পশ্চিমে। কৃত্রিমভাবে তৈরি করা এলাকার ধার দিয়ে হেঁটে গেলে একটা সময় লাতিন আমেরিকার বিস্তীর্ণ প্রান্তর চোখের সমুখে উন্মুখ হয়ে পড়ে। তাঁর পরবর্তী সংগ্রহ 'সান মার্টিন কপিবুক'-এ (১৯২৯) এমনই এক সুন্দর, প্রায়ই-উক্ত হওয়া কবিতা 'দ্য মিথিকাল ফাউন্ডেশন অব বুয়েনস এইরেস' শেষ হয় এভাবে:

একটা সিগার-স্টোরের সুবাস এই মরুভূমিতে হয়ে ওঠে গোলাপের ঘ্রাণ। একটা বিকালবেলা মনে করিয়ে দেয় গত হয়ে যাওয়া দিন, আর কজন পুরুষের মন ভারী হয়ে ওঠে অতীতের মায়ায়। কেবল একটা জিনিসেরই অভাব—এই রাস্তার আর অন্য কোনো দিক নেই। বিশ্বাস করা শক্ত, বুয়েনস এইরেসের শুরু বলেও কিছু আছে; বরং অনুভূত হয়, এই এইরেস হাওয়া-জলের মতোই অনন্তকাল ধরে প্রবহমান—বয়ে চলছে।

অন্য অনেক শহরবাসীর মতোই, অতীতে যা যা ছিল এবং যা এখন আর নেই, সেই নেই হয়ে যাওয়ার স্মৃতি নিয়ে বোর্হেস আশ্বেপ করছেন, ‘আমাদের কাছে আমাদের শহরের যে ছবি রয়েছে, তা এখন সব সময়ই পুরোনো, অনেক পুরোনো মনে হয়। ক্যাফেগুলো পানশালা হয়ে গেছে; আগেকার বিশালাকার তোরণের মতো দরজাগুলোয় আঙুরলতা ঝুলে থাকত, আবার বড় দরজায় গ্রিল দেওয়া একটা ছোট দরজাও থাকত। এখন সেই দরজার বদলে বরং একটা মলিন করিডর শুরু হয়, যেটা একটা এলিভেটরের সামনে গিয়ে শেষ হয়।’ ক্রিস মসক্রিস মস

এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়ানোর সময়, সব সময় আমার চোখ পুরোনো কিছু খুঁজে ফেরে। পুরোনো, ঝুলে পড়ে যাচ্ছে, বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে—এ রকম কিছু যা কোনো সুদূর অতীতের স্বাক্ষর বহন করে। এই রকম পুরোনো ল্যান্ডস্কেপ দেখার ইচ্ছা, হয়তো আমার বিদেশি হওয়ার কারণে এসেছে। কিন্তু এ-ও তো সত্য, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমি হয়তো একটু একটু করে পোর্টেনোই হয়ে উঠছি বরং, যার কারণে আমি খুঁজে পেতে চাই অতীতকে, কল্পনাকে কিংবা যেসব একটা সময় সত্য ছিল, সেসবকে। বোর্হেস তাঁর গল্পের মতোই ধ্রুপদি ইশারায় আর কল্পনার ধ্যানে তাঁর কবিতাকে ভরিয়ে তোলেন। বুয়েনস এইরেসকে একটা ধাঁধার মতো কল্পনা করায়, বোর্হেসকে মনে হয় যেন কোনো এক গোয়েন্দা, যিনি ৫০০ বছর পুরোনো শহরকে যেকোনো প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানের মতোই রহস্যময়, আকর্ষণীয় করে তুলছেন, ঘুরে বেড়াচ্ছেন নগরীর সেই অতীত-স্বরূপের খোঁজে।

একটা বড় শহরে ঘুরে বেড়ানো আত্মার জন্য আশীর্বাদের মতোই। উনিশ শতকের কবি এভারিস্তো ক্যারিগোর (১৯৩০) ওপর লেখা একটা ছোট প্রবন্ধে, বোর্হেস লিখছেন, ‘বুয়েনস এইরেস গভীর সমুদ্রের মতো। কখনোই আমি এর রাস্তাসমূহে হেঁটে বেড়াতে গিয়ে বিরক্ত কিংবা প্রতারণিত হইনি, বরং সব সময়ই এই হেঁটে বেড়ানো আমাকে নির্ভার করেছে, শান্তি দিয়েছে। এই শান্তি হয়তো পরাবাস্তব বোধ থেকে আসা, কিংবা পেছনের কোনো বারান্দার গিটারের সুর থেকে ভেসে আসা, অথবা অন্যান্য জীবনের সংস্পর্শ থেকে পাওয়া।’

বুয়েনস এইরেস, বোর্হেসের কবিতাকে অর্থবহ করে তোলে। যেটা আদতে শহরটাকেই বুঝতে সাহায্য করে। এখন, অনেক অনেক বছর পর এবং এক সমুদ্র দূরে, এই করোনাভাইরাস আরোপিত অদ্ভুত নস্টালজিয়ার ভেতর দিয়ে আমি তার কবিতাগুলো আবার পড়ি এবং আবার শহরটাকে দেখতে পাই, সময় আর স্মৃতির ভাঁজের মধ্য দিয়ে। যে শহরে বোর্হেস আমাকে পথ দেখান, তাঁর কবিতা ও শব্দের আলোয়। যেখানে একেকটা পায়ের চিহ্ন তাঁর শব্দ আর হেঁটে বেড়ানো তাঁর কবিতা।

তোমার অন্তরে কিছু আভা খেলা করে দিনরাত,  
বুঝি তাই সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের সাধনায় ব্রতী  
করেছে তোমাকে, আনোয়ার। এই ব্রতে  
আজীবন মগ্ন থেকে, শিল্পের সৃজনে পেয়ো সাফল্যের মালা।  
এখনো তরুণ তুমি, **সেলুলয়েডের** নীরবতা  
যিনি করেছেন ঢের চিত্রল, বাণ্ডময়, খ্যাতি যাঁর জ্বলজ্বলে  
বিশ্বজুড়ে, তাঁর উদ্দেশ্যেই  
আপন অঞ্জলি ভরে নানা পুষ্প করেছ অর্পণ।  
জেনেছি অনেক আগে, বলছি তোমাকে আজ গোধূলিবেলায়  
পোঁছে, জেনো, আনোয়ার, যিনি নিজে গুণী  
তিনিই পারেন ছুঁতে প্রকৃত জ্ঞানীর পদযুগ, তাঁর বাণী  
এবং সৃষ্টির বার্তা পোঁছে দিতে দিগ্বিদিক কল্যাণের টানে।  
ধন্য তুমি আনোয়ার, সেই ঢের স্বৈদক্ষ্যব্রত  
এ কৃপণ কালে স্বার্থহীনতায় করেছ গ্রহণ।  
চলচ্চিত্রশিল্পের মহান শিল্পী সত্যজিৎ রায়ের প্রতিভা  
তাঁর সৃষ্টি উদ্দীপিত করুক তোমাকে  
নিয়ত আপনকার সৃজনের অভিলাষে, ধনী করো  
স্বদেশের সংস্কৃতির বহমান ধারা।

৮ অক্টোবর ২০১১, ঢাকা

কখন, কীভাবে যে আমি সব্যসাচী সত্যজিৎ রায়ের সৃষ্টির প্রেমে পড়েছিলাম, আজ আর তা বলতে পারব না। ১৯৯২ সালের ২৩ এপ্রিল বিশ্ববরেণ্য এই শিল্পীর চিরবিদায়ের পর প্রায় ১০ বছর ধরে নানা লেখা ও বিচিত্র তথ্য-উপাত্ত জোগাড় করে ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয় আমার সম্পাদিত ৫০০ পৃষ্ঠার বই সত্যজিৎ রবীন্দ্রনাথ। সে সময় ডাকযোগে প্রায় ২০০ সৌজন্য কপি পাঠিয়েছিলাম বাংলাদেশ ও কলকাতার বিশিষ্টজনদের কাছে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই আজ প্রয়াত। বরেণ্য কবি শামসুর রাহমানও ছিলেন তাঁদের একজন। মাসখানেক পর থেকে শুরু হলো তাঁর প্রতিক্রিয়া জানার জন্য আমার অভিলাষ। চিঠি বা ল্যান্ডফোনই ছিল সে সময় যোগাযোগ বা আলাপের একমাত্র বাহন।

কেন জানি আমার মনে এমন প্রত্যাশা জেগে উঠল যে শামসুর রাহমানের দু-কলম লেখা বা পাঠপ্রতিক্রিয়া যদি পেতাম! তত দিনে পত্রিকাসূত্রে জেনেছি, বার্ধক্যের রোষানলে পড়ে তিনি অসুস্থ। তারপরও আমার মন নাছোড়। ভাবখানা এমন, সুস্থতা-অসুস্থতা বুঝি না, তাঁর লেখা বা অভিমত আমি শুনবই শুনব। তাই কিছুদিন পরপর ফোন করে অনুরোধের আর্তি প্রকাশ করে চলি, কিন্তু একবারও কবি জানতে দেননি তাঁর অসুস্থতার খবর। প্রতিবারই বলে গেছেন, ‘আনোয়ার, আমি লিখব, বইটা আমার মন কেড়েছে, আশাহত হয়ো না।’ তাঁকে আমি চিনতাম কবিতাসূত্রে। চাক্ষুষ দেখিনি কোনো দিন। আলাপ-পরিচয় তো দূরের কথা।

এর দিন পনেরো পর দ্বিধাদ্বন্দ্বের লাজ ভুলে আবার ফোন করলাম কবিকে। তবে মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, এটাই আমার শেষ অনুরোধ। ফোনে বেশ কিছুক্ষণ রিংটোনের পর অবশেষে ওপাশে শুনতে পেলাম তাঁর কণ্ঠ। কুশল বিনিময়ের আগেই তিনি বললেন, ‘আনোয়ার, তোমার সত্যজিৎ রবীন্দ্রনাথ এবং তোমাকে নিয়ে ছোট্ট একটা লেখা লিখেছি। কাগজ-কলম নিয়ে বসো। আমি পড়ছি

তুমি লেখো।’ প্রথমে লিখলাম লেখার শিরোনাম, ‘পূর্বসূরি ও উত্তরসাধক’। শুরু হলো তাঁর বলা এবং আমার লেখা। লেখার শেষে বুঝলাম, তিনি সত্যজিৎ রায়ের প্রতি আমার অনুরাগে মুগ্ধ হয়ে আমাকে নিয়ে ১৮ পঙ্ক্তির একটি কবিতা লিখেছেন! মনে মনে আমি তখন খুশিতে আটখানা। এর মাসখানেক পর ঢাকার এক কবিবন্ধুর সূত্রে হাতে পেলাম শামসুর রাহমানের কাটাকুটিসমেত সেই কবিতার খসড়া।

আমার জানামতে, ২০০২ সালের অক্টোবরে লেখা শামসুর রাহমানের এ কবিতা শুধু আমার কাছেই আছে। এটি আগে কোথাও প্রকাশিত হয়নি। কবিতাটিতে মেলে কবির সেই চিরচেনা স্বভাবসুলভ অনায়াস বলে যাওয়ার ভঙ্গি, মনে হয়, শামসুর রাহমান যেন আমার সামনে বসে কথা বলছেন!

40.....

‘সব শালা কবি হবে’—এই পঙ্ক্তি কেন লিখেছিলেন মোহাম্মদ রফিক  
আলতাফ শাহনেওয়াজ

একটি কবিতা ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল শাসকের। একটি কবিতার মধ্য দিয়েই আপামর মানুষের অন্তরে পৌঁছে গিয়েছিলেন একজন কবি—মোহাম্মদ রফিক। ‘সব শালা কবি হবে, পিঁপড়ে গোঁ ধরেছে উড়বেই,/ দাঁতাল শুয়ের এসে রাজাসনে বসবেই।’—এই দুই পঙ্ক্তি যেন বিদ্যুতের মতো ছড়িয়ে পড়ল সারা দেশে। যে কবিতার দুটি পঙ্ক্তি নিয়ে তোলপাড় হয়েছিল তখন এবং যে কবিতার পঙ্ক্তিগুলো স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে জুগিয়েছিল নতুন রসদ, তার নাম ‘খোলা কবিতা’। কবিতাটি মোহাম্মদ রফিক লিখেছিলেন আশির দশকে, স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে। পরে এই কবিতা লেখার জন্য সেই সময় তাঁকে দুর্ভোগও কম পোহাতে হয়নি। সেনানিবাসে ডেকে নেওয়া হয়েছিল তাঁকে। মামলা মাথায় নিয়ে যেতে হয়েছিল আত্মগোপনে। এই বিষয়গুলো এখন ইতিহাস। তবে গতকাল ৬ আগস্ট মোহাম্মদ রফিকের মৃত্যুর পর থেকে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ‘খোলা কবিতা’ এবং সেই ইতিহাসই আবার আলোচনায় এসেছে নতুন করে।

কীভাবে লেখা হয়েছিল ‘খোলা কবিতা’? সেদিনের মোহাম্মদ রফিক, যিনি তখন ছিলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের শিক্ষক, তিনি কার উদ্দেশে বলেছিলেন, ‘সব শালা কবি হবে’?

প্রশ্নগুলোর উত্তর জানার আগে ষাটের দশকের অন্যতম এই কবির বেড়ে ওঠা সম্পর্কে জানা দরকার। ১৯৪৩ সালের ২৩ অক্টোবর বাগেরহাটের বৈটপুর গ্রামে তাঁর জন্ম। কৈশোরে কৃষ্ণ নামের এক মেয়ের প্রেমে পড়েছিলেন। সেই প্রেমের আবেগে অষ্টম শ্রেণিতে থাকাকালে প্রথমবার কবিতা লিখেছিলেন। তবে প্রথম যৌবনে কবিতার চেয়ে রাজনীতিই তাঁকে বেশি পেয়ে বসে, বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লেষ ঘটে। ষাটের দশকে আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে সোচ্চার ছিলেন। এ সময় কারাগারেও যেতে হয় তাঁকে। কারাগার থেকে বের হয়ে রাজনৈতিক স্লোগান অপেক্ষা কবিতার পঙ্ক্তির মাধ্যমেই বলতে চেয়েছেন মানুষের মুক্তির কথা। তত দিনে ‘সমকাল’সহ সেই সময়কার বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হতে শুরু করেছে তাঁর কবিতা। ১৯৭১ সালে মোহাম্মদ রফিক যোগ দিলেন মুক্তিযুদ্ধে।

দেশমাতৃকার মুক্তি এবং দেশের সব প্রগতিশীল আন্দোলনে এই কবি ছিলেন সক্রিয়। ‘খোলা কবিতা’ তাঁর রাজনৈতিক সক্রিয়তার শিল্পিত নিদর্শন।

আশির দশকে প্রথম ভাগ। দেশে তখন চলছে সামরিক শাসন। পালাবদল হয়ে হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ বসেছেন ক্ষমতায়। মাঝেমধ্যেই তাঁর বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠছে ছাত্রজনতা। ওদিকে ক্ষমতার মসনদে বসার পর কবি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন এরশাদ। তখনকার বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকের প্রথম পাতায় ‘বিশেষ মর্যাদা’য় প্রকাশিত হতে শুরু করেছে তাঁর কবিতা। সে সময় কানাঘুষা এমন ছিল যে এরশাদের নামে পত্রিকার পাতায় যেসব কবিতা ছাপা হয়, তার রচয়িতা তিনি নন, অন্য কেউ। বিষয়টি নিয়ে আড়ালে-আবডালে অনেকেই কথা বলেন, তবে প্রকাশ্যে থাকেন মুখে কুলুপ ঝাঁটে। এই বাস্তবতায় প্রথম মুখ খুললেন মোহাম্মদ রফিক। সরাসরি এরশাদকে উদ্দেশ্য করেই লিখলেন ‘খোলা কবিতা’ নামের সেই বিখ্যাত কাব্য—‘সব শালা কবি হবে, পিঁপড়ে গোঁ ধরেছে উড়বেই।’

১৯৮৩ সালে সামরিক শাসক এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন যখন ধীরে ধীরে দানা বাঁধছে, তখনই কবিতাটি লিখলেন কবি। তাঁর সঙ্গে সে সময় কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ফরহাদের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। কমিউনিস্ট পার্টি তথা কমরেড ফরহাদের অনুপ্রেরণায় ১৯৮০-এর দশকে মোহাম্মদ রফিক গঠন করেছিলেন ‘সাংস্কৃতিক মঞ্চ’ নামে একটি সংগঠন। এ সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনকে বেগবান করা। সাংস্কৃতিক মঞ্চের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন দিলওয়ার হোসেন। ‘খোলা কবিতা’ রচনার স্মৃতিচারণা করেন তিনি, ‘আমি, কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়, তানভীর মোকাম্মেল, শফি আহমেদ, সুবীর দত্ত—সবাই মিলে আমরা তখন ধানমন্ডির ১ নম্বর রোডের তের নম্বর বাড়িতে থাকি। জাহাঙ্গীরনগর থেকে এখানে প্রায়ই আসতেন রফিক ভাই। কখনো কখনো রাতেও থাকতেন। “খোলা কবিতা”র একটি অংশ তিনি এখানে বসেই লিখেছিলেন।’

আগেই বলা হয়েছে, মোহাম্মদ রফিক তখন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক। শিক্ষকতার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক সংগ্রামেও দারুণভাবে সক্রিয়। ফলে কবি হিসেবে এরশাদের এই হঠাৎ উত্থান এবং পত্রিকার প্রথম পাতায় সেগুলো বিশেষভাবে ছাপা হওয়া তাঁকে পীড়িত ও ক্ষুব্ধ করেছিল। বিষয়টি ২০১৯ সালে বিবিসির এক সাক্ষাৎকারে মোহাম্মদ রফিক স্বীকারও করেছেন, ‘কবিতাটি আমি লিখেছিলাম ১৯৮৩ সালের জুন মাসের এক রাতে, এক বসাতেই। আমার মনে একটা প্রচণ্ড ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল, মনে হচ্ছিল একজন ভুঁইফোড় জেনারেল এসে আমাদের কবিতার অপমান করছেন।’

পুরো কবিতাটি ছিল অনেক বড়—প্রায় ১৬ পৃষ্ঠা। তো, কবিতা লেখার পর দেখা দিল মধুর এক সমস্যা। সামরিক শাসকের বিরুদ্ধে লেখা এই কবিতা প্রকাশ করবে কে? কার আছে এত বড় বুকের পাটা? স্বভাবতই কবিতাটি প্রকাশ করতে সাহস করছিল না কেউ। তখন কবির কিছু ছাত্র আর সুহৃদের উদ্যোগে এটি ছাপানোর বন্দোবস্ত হয়। গোপনে ছাপানো হয় ছাপাখানায়। পরে নিউজপ্রিন্টে এক ফর্মায় ছাপানো সেই কবিতা গোপনে বিলি করেন মোহাম্মদ রফিকের ছাত্রছাত্রীরা। হাতে হাতে নিষিদ্ধ ইশতেহারের মতো কবিতাটি ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে।

‘খোলা কবিতা’ মূলত এরশাদকে উদ্দেশ্য করে রচিত হলেও পরে মোহাম্মদ রফিক বলেন, ‘এটা শুধু এরশাদকে নিয়ে লেখা কবিতা নয়। এরশাদের মার্শাল ল জারি আমার কাছে একটা ঘটনা। একজন লোক, যে কোনো দিন লেখালেখির মধ্যে ছিল না—ভুঁইফোড়—সে আজ সামরিক শাসন জারির বদৌলতে কবিখ্যাতি অর্জন করবে, এটা মানতে পারছিলাম না।’

কবির কথা থেকে এটা স্পষ্ট, এক এরশাদ ও তাঁর সামরিক শাসন—দুটি বিষয় ‘খোলা কবিতা’র জন্মের ভরকেন্দ্র।

কবিতাটি যখন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে, তখন নড়েচড়ে বসেন গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন। এর মধ্যে একদিন মোহাম্মদ রফিকের ডাক পড়ে সাভারে সেনাবাহিনীর নবম পদাতিক ডিভিশনের দপ্তরে। এর আগে মামলা মাথায় নিয়ে তিন দিন হাজারীবাগে আত্মগোপন করে ছিলেন তিনি। মোহাম্মদ রফিককে যখন সেনাবাহিনীর দপ্তরে ডেকে নেওয়া হয়েছিল, কী ঘটেছিল সেখানে? কবির জবানে শোনা যাক সেই কাহিনি, ‘সেখানে তিনজন সেনা কর্মকর্তার মুখোমুখি আমি। তাঁদের প্রথম প্রশ্ন, “এটা কি আপনার লেখা?” আমি বললাম হ্যাঁ, আমার লেখা। আমি তাঁদের বললাম, আমি আপনাদের সব প্রশ্নের উত্তর দেব, কিন্তু একটা প্রশ্নের উত্তর দেব না। সেটা হচ্ছে, এটা কে ছেপে দিয়েছে। কারণ, আমি তাঁকে বিপদে ফেলতে চাই না।’

নির্ভীক কবি সেদিন এ কথাগুলো যখন বলেছিলেন, তার আগে যা হওয়ার তা হয়ে গেছে—একটি কবিতা, সামান্য কয়েকটি শব্দরাজি কাঁপিয়ে দিয়েছে সামরিক শাসকের তকত।

পরে অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা শেষে ১৯৮৪ সালে বইমেলায় ‘খোলা কবিতা’ বই আকারে বের হয়। প্রথমে এক ফর্মা থাকলেও বই করার সময় কবি মোহাম্মদ রফিক কবিতাটি বড় করেন। তখন বইয়ের আয়তন দাঁড়ায় ৪ ফর্মা। এ কবিতা লেখার সঙ্গে যেমন, তেমনি বইয়ের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন দিলওয়ার হোসেন। একদা সাংস্কৃতিক মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত এই মানুষটি বর্তমানে প্রকাশনা ব্যাবসায় যুক্ত। বই প্রসঙ্গে তাঁর কাছে জানতে চাইলে আবারও তিনি খুলে দিলেন স্মৃতির অর্গল, ‘মনে আছে, ১৯৮৪ সালের ১৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারি গোপীবাগের সুবর্ণ প্রিন্টার্সে রাত জেগে আমরা বইটি কম্পোজ করেছিলাম। সুবর্ণ প্রিন্টার্সের মালিক মজিবর রহমান ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত। এমন একটা বইয়ের সঙ্গে থাকতে পারছি, তা নিয়ে আমাদের তখন সে কী উত্তেজনা! অবশেষে ২১ ফেব্রুয়ারি “খোলা কবিতা” আমরা মেলায় আনতে পেরেছিলাম। বই নিয়ে আমি আর রফিক ভাই গিয়েছিলাম মেলায়।’

বই হিসেবেও ‘খোলা কবিতা’ পাঠকেরা গ্রহণ করেছিল। এরপর দিনে দিনে এটি স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে অনেকটা শ্লোগানের মতোই হয়ে ওঠে। মূলত ‘খোলা কবিতা’র জন্যই ‘সব শালা’ কবি হতে পারেনি।

41.....

বললেন, ‘লেখো লেখো, সবাই ভুলে গেছে’

লেখা: সাদিকা রুমন

গতকাল রোববার রাতে প্রয়াত হয়েছেন ষাট দশকের অন্যতম কবি মোহাম্মদ রফিক। তাঁকে নিয়ে লিখেছেন এক তরুণ কবি।

দেখা হতো না, কথাও অতটা আর হতো না, তবুও তো মনে হতো তিনি আছেন। এখনো আছেন। হঠাৎ করে সবটাই কেমন নেই হয়ে গেল! হঠাৎ চেনা পৃথিবীটা তাঁর নাম আর ছবিতে ছেয়ে গেল। কিন্তু তিনি নাকি কোথাও নেই! তিনি আর কথা বলবেন না! কোনোদিন না!

তিনি তো বলবার আনন্দে বলতেন। আমি সব মূর্খতা নিয়ে, সব অজ্ঞতা নিয়ে শুনে যেতাম তাঁর বাড়ির বারান্দায় বসে। যে বাড়ির ঠিকানা আমি বরাবর ভুলে যাই। শুধু পথ চিনে গেট দিয়ে ঢুকে যেতে পারি। শেষবার একটা ডাক পাঠাবার জন্য ঠিকানাটা চেয়েছিলাম।

অন্য কারও কাছে না পেয়ে তাঁকেই ফোন করলাম। ঠিকানা বললেন। শুরুতে নিজের নামটাও

বললেন। আমি বললাম, নাম মনে আছে স্যার। তিনি বললেন, লেখো লেখো সবাই তো ভুলে গেছে। কয়েক দিন পর নিজেই গেলাম ডাক না পাঠিয়ে। ভীষণ আপ্লুত হলেন। বললেন, আর কেউ হলে আসতে না করে দিতাম, তুমি বলেই আসতে বললাম, সবাই তো ভুলে গেছে। শেষ কবিতার বইটার উৎসর্গপত্রে তাঁর নাম লেখা ছিল। সেটা দিতেই যাওয়া। অতটা খুশি হবেন ভাবতে পারিনি। শুদ্ধ দা ফোন করলেন মাঝে। স্যার শুদ্ধ দাকে বইটা দেখিয়ে বললেন, দেখো, রুমন আমাকে বই উৎসর্গ করেছে! আমি ক্ষুদ্র। আমার কী সাধ্য তাঁকে দিই! প্রাপ্তি তো আমার হলো! তাঁর সেই অনাবিল খুশিটুকু আমার প্রাপ্তি। সেটাই আমার সঞ্চয়ে থাকা তাঁর শেষ স্মৃতি। সেবারেও গল্পের ঝুলি খুললেন বরাবরের মতোই। তবে বিষয় বদলেছে টের পেলাম। স্পিরিচুয়ালিটি নিয়ে আগে ওভাবে বলতে শুনিনি। নতুন একটা শব্দবন্ধের সঙ্গে পরিচয় ঘটল। বললেন, আমি নিজেকে এখন সুফি মার্কিস্ট মনে করি। তারপর বহুদিন ভাবনায় সুফি মার্কিস্ট কথাটা আনাগোনা করেছে। না, ভুলিনি। কখনো ভুলিনি। তিনি তো পিতার মতো করে ছিলেন। দূরে থেকেও জানতাম, আছেন। বাবা চলে যাওয়ার পর একটা গানের সঙ্গে পরিচয় করিয়েছিলেন। আগে শোনা ছিল না: “ডু নট স্ট্যান্ড অ্যাট মাই গ্রেভ অ্যান্ড উইপআই অ্যাম নট দেয়ার; আই ডু নট স্লিপ।” আজও যে আবার পিতৃহারা হলাম। আজ কার কাছে যাই!

42.....

দাগ

লেখা: আবুল হাসান

তাহলে কি আমার ফুসফুস  
ব্যাঙের ছাতার মতো ভেঙে গেছে  
রক্তের **করিডরে** নিয়তির আশকারা পেয়ে  
মরণকে কোলে নিয়ে বসে আছে যক্ষ্মার জীবাণু আর  
খুনসুটি করছে খুব তাকে নিয়ে  
লজ্জা-শরমের কোনো বালাই রাখছে না  
তাহলে কি মস্তিষ্কের **ছাদের** তলায় বসে  
বসন্তের হাওয়া খাচ্ছে দাগি চোর, আমার অসুখ তার  
ব্যাগে নিয়ে বিষাক্ত ক্যানসার।  
তাহলে কি সময়ের একপাশে রাখা স্মৃতি  
বহুদিন অপব্যবহারে হলুদ কপির মতো পচে গেছে  
তোমার সে কুশল সংবাদ,  
ভালো থেকো, চিরকাল যেখানেই থাকো।  
রবিবাসরীয় ইত্তেফাক, ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭০

43.....

যথাযথ মানুষ

লেখা:

মানুষের কাছে তার ব্যবহৃত আলাপই প্রধান তবু  
সব দৃশ্যাবলি, পরিবর্তনের পরে নতুন দৃশ্য আর শিহরণ জন্ম নেয়  
মানুষের মনে,  
ফের একেকটি মানুষ হয়ে ওঠে একেকটি পৃথিবী,  
আমি সেই পৃথিবীর পার্শ্বে বসে যেন এক শোকসভা  
তুলে নিয়ে যাব দুই চোখের ভিতর চিরকাল,  
এইভাবে বন্ধুর সহিত বসে সমন্বরে খুলে দিই শহরের  
সুড়ঙ্গভূমির অভিসার,  
স্বপ্ন থেকে পাতালে যাওয়ার একমাত্র পথ হৃদয়ের সামনে বসে  
বলে যাই তবুও দোহাই, আর এই লক্কড় সংসর্গ দিয়ে  
গানের গভীর ভান কোরো না এখানে;  
দেখেছি মানুষ ও পশুর চারণভূমি কোন ঘাসে বেড়ে ওঠে,  
সজারুর সহানুভূতিতে কার শরীরের আরাম উদ্ভুদ্ধ হয়;  
দেখেছি বিজয় আর বিনয়ের বাঁকে বাঁকে কোন স্বপ্ন দাঁড় বায়  
বিষের বাক্যের।  
যাকে চিনি, তাকে কয়েকটি শব্দের সাথে চিনি,  
তার সুড়ঙ্গের সাথে নেই আপন পরিচয়,  
একটি মানুষ তার বুকুর ভিতর তাই পোষে সেই অজস্র মানুষ,  
একটি মানুষ তার বন্ধুর বিপদে খোঁজে শ্রেষ্ঠ সাহায্যকে,  
একজন রাত জেগে, জীবনযাপন থেকে যাবতীয় দুঃখাবলি  
ধীরে ধীরে করে রাখে বালিশে চয়ন।  
একজন তার আপন সংসার ভুলে মাতা ও পিতার হেয় হীন হত্যা  
ঘৃণার দৃশ্যে দেখে আর  
একজন নিজস্ব স্ত্রীকে পুঁতে আপন সংসার শেষে যায় চলে  
একা একা নিজের ভুবনে,  
একজন সেখানেই এককে মিলায় দৃশ্যে দুঃখ ও সংগ্রাম  
যেন ঝরনা চলে যায়  
পাহাড়—উপল থেকে নদী...বলি  
হে কাল, হে স্মৃতি, সেই যথাযথ মানুষ কোথায়?  
রবিবাসরীয় ইত্তেফাক, ১৮ জানুয়ারি ১৯৭০

44.....

মৃত্যুর সন্তাপ



লেখা: মারুফ রায়হান

অন্ধকারে উপেক্ষায় জাগরুক জননী-সমাধি  
পুত্র তার মদমত্ত, উপরন্তু বিশ্ব্তির ব্যাধি  
রৌদ্রদন্ধ ছায়াহীন পুষ্পহীন মায়ের কবর  
সতত সুলভ মাল্যে তৃপ্ত বটে পুত্রমান্যবর  
সন্তান স্বয়ম্ভু নয়, তবু ভাব স্বয়ং ঈশ্বর  
বিহ্বল বাতাস নিত্য যায় বুনে আর্দ্র মাতৃস্বর  
পৃথিবী অবাক, ছিন্ন নাড়ি মানে বিচ্ছিন্ন উৎসন্ন!  
মেঘে-মেঘে ভ্রামণিক মা-কি বাস্তবিক অবসন্ন?  
অতিমারি এসে অভিজ্ঞতা বদলেছে অতিকায়  
আবেগ পরাবাস্তব, নরমাংস মানুষেরা খায়  
যারা ভাগ্যবান, তারা সব অনুপস্থিতির দলে  
জীবিতরা জীবন্মৃত, মা-হারা পুত্রেরা জগদলে  
কোলশূন্য মা বলেন: শতবর্ষ বেঁচে থাক বাছা,  
মাটির ওপরে থাক, এ-শয্যা ভরুক আগাছায়॥

45.....

অতলান্তিক

শুভাশিস সিনহা

তুমি সাদা হলে বলে, কালো  
অক্ষর জড়াল ও-শরীর,  
হৃদরক্তে কে যেন মাখাল  
লাল লাল চিহ্ন কুঁড়িটির।  
হাওয়াতে নাওয়াতে গিয়ে প্রাণ  
শূন্যের ভেতরে এক পাখি  
ইশারা ভাষায় করে গান  
সুরে ও বেসুরে মাখামাখি।  
তুমি সুর নিলে বলে, কথা  
আজীবন মজে তোমা টানে  
কী চঞ্চল, কী যে নীরবতা  
চেউয়ে চেউয়ে ভাটিতে-উজানে  
আঁচড়ে আঁচড়ে জলছবি  
সুরপুরে অতল ভৈরবী...

46.....

যে আকাশে সমুদ্র কাঁদে  
লেখা: লায়লা ফারজানা

আকাশ তো কতই কেঁদেছে  
সমুদ্রে মুখ লুকিয়ে  
পোড়াব্রিজ পার হয়েছে কে কবে?  
শিশিরের কান্নায় ভারী হয়েছে ফুলগুলো,  
সমুদ্রের কান্নার আকাশ কই?

47.....

মানুষের জীবন  
লেখা: মতিন রায়হান

মানুষের জীবন তো প্রায় এক ঘূর্ণাবর্ত বিহঙ্গজীবন  
কর্মসূত্রে ডানা মেলে ইতস্তত ওড়াউড়ি; ঋতুবৃত্তে  
কখনোবা রেখে যায় স্থায়ী কোনো ছাপ; কখনোবা  
পুষ্প হয়ে ফোটে শাখায় শাখায়; শিশিরের শব্দে  
যে হেমন্ত টেনে আনে নবান্নের গান, তার কাছে  
জমা রাখি ধানশালিকের খুনসুটি আর দুরন্ত প্রণয়;  
মায়াবী সন্ধ্যাকে যারা অহেতু বিষণ্ণ করে তোলে  
সেখানে থাকুক তবে জীবনের রং ছড়িয়ে-ছিটিয়ে;  
সকালের মায়াগন্ধা রোদ থেকে তুলে নিই শিশিরার্দ্র  
আলো—যে আলোয় দেখি রোজ প্রীতিসিক্ত পৃথিবীর  
মুখ; আমার যা কিছু আছে লিখে দিই আজ তোমার  
নামেই; ঠিক সেটাই চেয়েছি যেন একক জীবনে  
মায়া হরিণীর পদচিহ্নে যখন উঠেছে জেগে ঘন বন  
মানুষের জীবন তো প্রায় এক ঘূর্ণাবর্ত বিহঙ্গজীবন!

48.....

এখনো কলম্বাস  
লেখা: জারিফ আলম

ডাঙায় বসেই ভাসছি আমি চতুর্দিকে সমুদ্র  
খুঁজে বেড়াই কোথায় আছে কোন উপদ্বীপ  
নোঙর হবে আবার আমি পেরিয়ে যাব

বিপৎসীমা কার ভরসায়!  
কখনো তাই লোকাল বাসে যাত্রীবোঝাই  
ঘেমে-নেয়ে হই একাকার, থামবে কোথায়  
ভাসতে ভাসতে চলাই এখন এই তো দেখি  
সাত সমুদ্র তেরো নদী কোথায় দাঁড়াই।  
অনেক ভিড়ে লড়ছি একাই নিজের সাথে  
আড্ডা শেষে চাঁদের আলো ফিনিক ফোটে।  
ঘুমিয়ে যাবার বায়না নিয়ে ফিরছি ঘরে  
চোখের পাতা এক হলো না ভাসছি আবার  
একলা এখন সমুদুরে।  
কলম্বাসের ভারতবর্ষ কোথায় আছে—  
এমন ভেবে পাইনি খুঁজে থামব কোথায়!  
আমিও নাহয় ভুলে ভরা জীবনটাকে  
নাম পরাব ভুলের শিখায়!

49.....

আল মাহমুদ যেভাবে 'আমাদের'  
আলতাফ শাহনেওয়াজ

গতকাল ১১ জুলাই ছিল বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি আল মাহমুদের জন্মদিন। কীভাবে 'আমি' থেকে 'আমাদের' হয়ে উঠেছিলেন এই কবি? ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে এ লেখায় বলা হয়েছে সেই কাহিনি।

সারা দিন চলে গেল...সারাটা দিন। কাল আমার খুব উচাটন লেগেছে দিনভর। সারা দিন নেট ঘেঁটে ঘেঁটে তাঁর অনেক কবিতা পড়লাম। শতবার পড়া কবিতা, তবু পড়লাম, 'কবিতা তো মক্তবের মেয়ে চুল খোলা আয়েশা আক্তার....'—এসব পড়তে পড়তে কত স্মৃতি যে মনে পড়ল! ফিরে দেখলাম, নিজের জীবন।

নিজের কথা বলতে গিয়ে এ লেখার শিরোনামে 'আমাদের' শব্দটি ব্যবহার করা হলো কেন? এমনটা কেউ ভাবতেই পারেন। এ প্রশ্নও তুলতে পারেন যে 'আমাদের'—এর মতো সাধারণ শব্দকে এখানে উদ্ধৃতিচিহ্নের মোড়কে বিশেষায়িত করার কারণ কী! তা-ও আবার কবি আল মাহমুদ প্রসঙ্গে। তিনি যে আমাদের—অর্থাৎ বাংলাদেশের সবার, তা নিয়ে তো সন্দেহ নেই। তবে শুরুতেই বলে নেওয়া ভালো, 'আমাদের' শব্দটি এতে সচেতনভাবে বিশেষ অর্থেই বসানো হয়েছে।

আমিত্বের মধ্যে লীলা করতে করতে কবি সাধারণত নিজের আনন্দেই কাব্য লেখেন। কিন্তু কোনো কোনো কবি জনসংস্কৃতির নাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে মানুষের দৈনন্দিকতাকে, একেক মানুষের অনুভূতিকে আলাদা আলাদাভাবে স্পর্শ করেন। তখনই তাঁকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করার দায় থাকে। আর এ সময়ই পাঠকের মনে হয়, আশ্চর্য, এখানে তো আমার মুখই দেখা যাচ্ছে! কালে কালে এভাবেই 'আমার' থেকে ধীরে ধীরে 'আমাদের' হয়ে ওঠেন গুটিকতক কবি।

আল মাহমুদের কবিতা পড়তে গেলেই এসব মনে হয় আমার। শুধু আমার কেন, আরও কারও কি

মনে হয় না? ‘সোনার দিনার নেই, দেনমোহর চেয়ো না হরিণী/যদি নাও, দিতে পারি কাবিনবিহীন হাত দুটি’—‘সোনালি কাবিন’—এর এই অমর পঙ্ক্তি চিরকুট হিসেবে প্রেমিকাকে পাঠিয়েছেন—বিভিন্ন প্রজন্মে এমন মানুষের সংখ্যা নেহাত কম নয়। অথবা ওই একই সনেট-কাব্যের ‘আমাদের ধর্ম হোক ফসলের সুষম বণ্টন,/পরম স্বস্তির মন্ত্রে গেয়ে ওঠো শ্রেণীর উচ্ছেদ’—এই যুগল চরণকে স্লোগান করে, সাম্যবাদে আস্থা রেখে একদা কি অনেকে স্বপ্ন দেখেননি নতুন ভোরের!

গতকাল ১১ জুলাই আল মাহমুদের জন্মদিনে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যেভাবে তাঁর কবিতা ছড়িয়ে পড়ল, তা দেখে মনে পড়ল, এসব পঙ্ক্তির ছন্দ-অনুভব যেন আমার জীবনের মোহনায়ও মিলে গেছে, খোলা বইয়ের মতো প্রকাশ্য হয়ে উঠছে স্মৃতির পৃষ্ঠাগুলো।

কথাগুলো আমার ব্যক্তিজীবনের। তবু খুব কুণ্ঠিত চিন্তে এই ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণাই মেলে ধরা; তা এই আকাঙ্ক্ষায় যে সামষ্টিক যৌথ অনুভবে ব্যক্তিস্মৃতি কিছু যদি যোগ করে!

একজন মানুষ—আল মাহমুদ—বাংলা ভাষার এই একজন কবি—প্রথমবার যাঁর মুখোমুখি হয়ে আক্ষরিক অর্থেই আমি একদা কেঁপে উঠেছিলাম। মনে হয়েছিল, আমি সত্যিই আল মাহমুদের সামনে বসে আছি! আল মাহমুদ!

কেন জানি না, সব সময় আমি আল মাহমুদের মতোই হতে চেয়েছি। তাঁর কবিতা আমাকে আক্রান্ত করার ফলেই হয়তো। অথবা এমনও হতে পারে, মফস্সল থেকে ঢাকায় এসে তিনি যেভাবে যুদ্ধ করেছেন—সেই পঞ্চাশের দশক থেকে পরবর্তী অনেক দিন—বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে সেসব পড়ে আমি ভেবেছি, আমিও তো মফস্সলের, আমাকেও এভাবে যুদ্ধ করতে হবে। যেতে হবে শহর ঢাকায়। কারণ, আমি তো কবিই হতে চাই। একজন মফস্সলবাসী কবিশ্রমপ্রার্থীর অনুপ্রেরণা হিসেবে সে সময় আল মাহমুদই ছিলেন আমার একমাত্র আদর্শ—‘আইডল’।

গেল শতকের শেষ ভাগের শেষ বছর। মাধ্যমিক পাস করার পর কবিতা যখন আমাকে পুরোপুরি গ্রাস করে ফেলেছে, তখন হঠাৎ মনে হলো, আরে, এত বিদ্যাশিক্ষা করে কী হবে! আল মাহমুদ ক্লাস এইট পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন, সেই তুলনায় আমি তো দুই ক্লাস বেশিই পড়ে ফেলেছি। এমন ভাবনা থেকে একাডেমিক লেখাপড়ার পাট সিক্যে উঠল আমার এবং ঘরের চৌকাঠ ডিঙিয়ে আমি বাড়িছাড়া হয়ে গেলাম। যদিও এখন বুঝতে পারি, কতটা ছেলেমানুষি ও শিশুতোষ ব্যাপার ছিল এসবের ভেতর। ‘...কেবলই আমার মধ্যে এক শিশু আর পশুর বিরোধ’—এ চরণ তো আল মাহমুদেরই। ‘শিশু আর পশুর বিরোধ’ নিয়ে শুরু থেকেই পথ চলছি। তাকে এড়ানোর সাধ্য কী আমাদের!

তাই হয়তো একসময় আমার মনে হতো, স্কুলজীবনে আল মাহমুদ যেভাবে কলকাতায় চলে গিয়েছিলেন (এ বিষয়ে বিস্তারিত লেখা আছে কবির ‘যেভাবে বেড়ে উঠি’ নামের আত্মজৈবনিক উপন্যাসে), আমিও চলে যাব সেভাবে। ঘর ছেড়ে বেরিয়েও পড়েছিলাম—নিজের জন্মশহর ঝিনাইদহ থেকে প্রথমে ফরিদপুর, তারপর ঢাকা—সেসব বেহিসেবের বোহেমিয়ান দিন ছিল বটে! পরে ঢাকায় থিতু হওয়ার পর নানা কাজের সূত্রে অনেকবার গিয়েছি মগবাজারে, আল মাহমুদের বাসায়। যাওয়া-আসার ঘনঘটায় তত দিনে এই বয়োবৃদ্ধ লোক ‘মাহমুদ ভাই’ হয়ে উঠেছেন আমার কাছে। তাঁর সঙ্গে দেখা হলেই বলতেন, ‘সিগারেট এনেছ?’

আমি পকেট থেকে বের করে দিতাম একপ্যাকেট সোনালি বেনসন। ২০১৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি যেদিন তিনি মারা যান, এই ঘটনা তার মাস ছয়েক আগেও ঘটেছে।

মাহমুদ ভাইয়ের বাড়িতে যেতে আমার ভালো লাগত। কবির সঙ্গে তর্ক-বিতর্কও চালানো যেত দেদার। তাঁর অনেক কিছুর সঙ্গে আমি একমত পোষণ করিনি। তাতে অবশ্য মাহমুদ ভাইয়ের

কবিতার আশ্বাদ নেওয়া বা তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক—কোনোটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। নিজের মত জারি রেখেই এই কবির সঙ্গে মেশা যেত, এ ছিল এক মস্ত সুবিধার ব্যাপার।

এখন আমার স্ত্রী যিনি—ফাতেমা আবেদীন নাজলা—মনে আছে, ২০১৩ সালে তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলাম আল মাহমুদের বাসায়। আমার আর নাজলার মধ্যে তখন কেবল নিরেট বন্ধুত্ব, অন্য কোনো কিছু নয়। তো, ঘণ্টাখানেক কথাবার্তা শেষে কবি আমাদের বললেন, ‘তোমরা দুজন দুজনকে পছন্দ কর, না?’

নাজলার কথা জানি না। তবে আমি বেশ লজ্জা পেয়েছিলাম এ কথায়; এবং এ-ও অস্বীকার করব না যে তখনই আমার প্রথম মনে হয়েছিল, এই মেয়েকে কি আমি পছন্দ করি?

নিজের কাছে নিজের উত্তর ছিল, করি হয়তো।

নাজলার সঙ্গে ভাবনাচিন্তায় আমার অনেক অমিল। কিন্তু প্রথম থেকে একটা জায়গাতেই মিল প্রচণ্ড—সেটা হলো আল মাহমুদ। তিনি আল মাহমুদে অবসেসড, আমিও।

আল মাহমুদের অজস্র কবিতা—‘সোনালি কাবিন,’ ‘প্রত্যাবর্তনের লজ্জা,’ ‘বাতাসের ফেনা’ ‘খড়ের গন্ধুজ,’ ‘ফরফুরের কবরে কালো শেয়াল,’ ‘কবিতা এমন’—এসব পড়লে আমি আমার আশ্মাকে দেখতে পাই, ফেলে আসা আমার বাড়িঘর দেখতে পাই, গ্রামকে দেখতে পাই, দেখতে পাই মফস্সলকে। সব মিলিয়ে ভূপ্রকৃতি, মানুষজনসমেত গোটা বাংলাদেশই তো হাজির আল মাহমুদের কবিতায়।

যদিও তিনি বলেছেন, ‘শহর ছাড়লে সুখ নাই। আসলে সুখ হলো শহরে’, তারপরও দেখাশোনা থেকেই এ কথা বলতে চাই যে কবিতা এবং নিজের জীবনাচরণেও আল মাহমুদ ছিলেন গ্রামজনপদের বাসিন্দা। গ্রামের মানুষ যেমন অতটা আদবকেতার ধার ধারে না, তাদের মধ্যে যেমন কুটিলতার পাশাপাশি নির্মল স্নিগ্ধ এক সরলতা বিরাজমান, মাহমুদ ভাইও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। কখনো বা তাঁর ভেতরে শতভাগ খাঁটি গ্রাম্যতাও প্রত্যক্ষ করেছি। আর এই ‘গ্রাম্যতা’ এবং সারল্যের কারণেই বোধ করি, কবিতায় মুগ্ধ হওয়ার পরও শহুরে নাগরিক সমাজ তাঁকে অভিজাতরূপে গ্রহণ করতে অনীহা দেখিয়েছে, তাঁর সময়ের অন্য কবিদের তুলনায়।

মাহমুদ ভাইকে আমার ‘আলাদিনের গ্রামে’ সনেটগুচ্ছের কয়েকটি সনেট শোনাতে পেরেছিলাম। তখন তিনি ‘কানা মামুদ’, চোখে একেবারেই দেখেন না। তাই আমাকেই পড়তে বললেন। পড়লাম। আবারও পড়তে বললেন। পুনরায় পড়লাম। পড়া শেষে দেখি, কবির চোখে পানি। আমাকে শুধু বললেন, ‘ছন্দে তোমার হাত ভালো। তোমার কবিতায় বাংলাদেশ আছে।’

কেউ যখন কারও কবিতাকে ভালো বলে, তখন ওই কবিতারচয়িতার ভালো না লাগার কোনো কারণ নেই। স্বাভাবিকভাবেই কেউ আমার কবিতার প্রশংসা করলে আমারও ভালো লাগে। তবে সেই ২০১২ সালে মাহমুদ ভাই আমার কবিতা নিয়ে যা বলেছিলেন এবং তাতে আমি যতটা খুশি হয়েছিলাম, আর কোনো প্রশংসায় এত আনন্দিত হইনি।

পারি বা না পারি, হোক বা না হোক, সব সময় আমি বাংলাদেশের কবিতাই লিখতে চেয়েছি। আর এ ক্ষেত্রে আবারও অনুপ্রেরণা ওই আল মাহমুদই!

আমার মতো অসংখ্য তরুণ কবিকে স্বপ্ন দেখিয়ে, লড়াইয়ের ময়দানে ঠেলে দিয়ে তিনি কেবল পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশের নয়, ‘আমাদের’ হয়ে উঠেছেন।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে কাল সকাল থেকে গুগল খুঁটে খুঁটে তাই আল মাহমুদেরই কবিতা পড়ছি, ‘ভোলো না কেন ভুলতে পারো যদি/চাঁদের সাথে হাঁটার রাতগুলি/নিয়াজ মাঠে শিশির-লাগা ঘাস/পকেটে কার ঠান্ডা অঙ্গুলি।’

‘খড়ের গম্বুজ’-এর কবির লিখে যাওয়া ঠান্ডা আঙুলই কি আনমনে বারবার বলছে:

‘কে যেন ডাকল তাকে; সন্নেহে বলল, বসে যাও লজ্জার কী আছে বাপু তুমি তো গাঁয়েরই ছেলে বটে, আমাদেরই লোক তুমি। তোমার বাপেরমারফতির টান শুনে বাতাস বেহুঁশ হয়ে যেত। পুরোনো সে কথা উঠলে এখনো দহলিজেসমস্ত গায়ের লোক নরম নীরব হয়ে শোনে। সোনালি খড়ের স্তূপে বসতে গিয়ে প্রত্যাগত পুরুষ সেজনকী মুশকিল দেখল যে নগরের নিভাঁজ পোশাকখামচে ধরেছে হাঁটু। উরতের পেশি থেকে সোজা অত দূর কোমর অবধিসম্পূর্ণ যুবক যেন বন্দী হয়ে আছে এক নির্মম সেলাইয়ে।’

নাগরিক পোশাকে বন্দী হয়ে ‘গ্রামীণ’ আল মাহমুদের একটার পর একটা কবিতা পড়ে চলেছি আর এসব কবিতার পঙ্ক্তির দোলায় স্মৃতিরা ঘিরে ধরছে আমায়। সবাই দেখছে, অফিসের কাচঘেরা ঘরে বসে আছি আমি। কিন্তু আমি জানি, ততক্ষণে আমি চলে গিয়েছি ঝিনাইদহের সিটি কলেজ মাঠে অথবা পোড়াদাহ রেলস্টেশনে, কখনো বা শ্মশানঘাটে। ফরিদপুরের আলিপুরেও কি বসে ছিলাম না?

এখনো যখন ‘প্রত্যাবর্তনের লজ্জা’ কবিতাটা পড়ি, এবং ওই জায়গাটা পড়ি, ‘আসার সময় আঝা তাড়া দিয়েছিলেন, গোছাতে গোছাতেই তোর সময় বয়ে যাবে, তুই আবার গাড়ি পাবি।/আম্মা বলেছিলেন, আজ রাত নাহয় বই নিয়েই বসে থাক,/কত রাত তো অমনি থাকিস।’ লাইনগুলো পড়ি আর আম্মাকে মনে পড়ে আমার। আঝার চোখটা ভাসে।

এখনো যখন বাড়ি থেকে ঢাকায় ফিরে আসি, তার আগের দিন, আম্মা আমাকে বলেন, ‘আরেকটা দিন থেকে যা, বই-টাই পড়।’ আর আঝা বলেন সেই কথা—গ্রামের, লোকেরা যা বলে!

এই মওকায় চলুন ‘প্রত্যাবর্তনের লজ্জা’ কবিতাটিতে আবার চোখ ফেরানো যাক। আল মাহমুদের সামনে কেউ এই কবিতা পড়লে মাহমুদ ভাই হাউমাউ করে কাঁদতেন। সে এক মর্মান্তিক দৃশ্য বটে, মনোহরও।

আল মাহমুদশেষ ট্রেন ধরব বলে একরকম ছুটতে ছুটতে স্টেশনে পৌঁছে দেখিনি লবণ আলোর সংকেত। হতাশার মতন হঠাৎ দারুণ হুইসেল দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। যাদের সাথে শহরে যাবার কথা ছিল, তাদের উৎকণ্ঠিত মুখজানালায় উবুড় হয়ে আমাকে দেখছে। হাত নেড়ে সান্ত্বনা দিচ্ছে। আসার সময় আঝা তাড়া দিয়েছিলেন, গোছাতে গোছাতেই তোর সময় বয়ে যাবে, তুই আবার গাড়ি পাবি। আম্মা বলেছিলেন, আজ রাত নাহয় বই নিয়েই বসে থাক, কত রাত তো অমনি থাকিস। আমার ঘুম পেল। এক নিঃস্বপ্ন নিদ্রায় আমি নিহত হয়ে থাকলাম। অথচ জাহানারা কোনো দিন ট্রেন ফেল করে না। ফরহাদ আধঘণ্টা আগেই স্টেশনে পৌঁছে যায়। লাইলিমালাপত্র তুলে দিয়ে আগেই চাকরকে টিকিট কিনতে পাঠায়। নাহার কোথাও যাওয়ার কথা থাকলে আনন্দে ভাত পর্যন্ত খেতে পারে না। আর আমি এদের ভাইসাত মাইল হেঁটে এসে শেষ রাতের গাড়ি হারিয়ে এক অখ্যাত স্টেশনে কুয়াশায় কাঁপছি। কুয়াশার সাদা পর্দা দোলাতে দোলাতে আবার আমি ঘরে ফিরব। শিশিরে আমার পাজামা ভিজে যাবে। চোখের পাতায় শীতের বিন্দু জমতে জমতে নির্লজ্জের মতন হঠাৎ লাল সূর্য উঠে আসবে। পরাজিতের মতো আমার মুখের ওপর রোদনামলে, সামনে দেখব পরিচিত নদী। ছড়ানো-ছিটানো ঘরবাড়ি, গ্রাম। জলার দিকে বকের ঝাঁক উড়ে যাচ্ছে। তারপর দারুণ ভয়ের মতো ভেসে উঠবে আমাদের আটচালা। কলার ছোট বাগান। দীর্ঘ পাতাগুলো না না করে কাঁপছে। বৈঠকখানা থেকে আঝা একবার আমাকে দেখে নিয়ে মুখ নিচু করে পড়তে থাকবেন, ফাবি আইয়ে আলা ই-রাব্বিকুমা তুকা জিবান...। বাসি বাসন হাতে আম্মা আমাকে দেখে হেসে ফেলবেন। ভালোই হলো তোর ফিরে আসা। তুই না থাকলে ঘরবাড়ি একেবারে কেমন শূন্য হয়ে যায়।

হাত-মুখধুয়ে আয়। নাশতা পাঠাই। আর আমি মাকে জড়িয়ে ধরে আমার প্রত্যাবর্তনের  
লজ্জাকে ঘষে ঘষে তুলে ফেলব।

আদতে আল মাহমুদের কবিতা পড়লে আমি আমার কাছে, নিজের জীবনেই কাছেই ফিরি। বড়  
কবিদের কবিতা পড়লে এমন হয়, মনটা কেন জানি উচাটন হয়ে ওঠে।

মাহমুদ ভাই, প্রিয় কানা মামুদ, আপনাকে দেখতে কোনো একদিন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় যাব চুপি চুপি।  
তবে ঢাকায় ফেরার সময় কি আর ট্রেন মিস করতে পারব, করা হবে?—হা জীবন!

50.....

আল মাহমুদ কেন নিঃসঙ্গ ছিলেন

লেখা: রাফাত মিশু

আজ কবি আল মাহমুদের জন্মদিন। তাঁকে নিয়ে অনেক দ্বিধা কাজ করে আমাদের। এই দ্বিধার  
পেছনের কারণগুলো কী? স্বাধীন বাংলাদেশে কেন দিন দিন নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন ‘সোনালি  
কাবিন’-এর এই কবি? জন্মদিনে তাঁর কবিতা ও গদ্যের অনুষ্ঠে প্রশ্নগুলোর সলুকসন্ধান।  
বাংলাদেশের প্রধান কবি হয়েও মূলধারার কবিদের সঙ্গে আল মাহমুদের (১৯৩৬-২০১৯) তফাতটা  
কোথায়, তা কবিতা দিয়েই বোঝা সম্ভব। কিন্তু স্বাতন্ত্র্য, তফাত, পার্থক্য আর একঘরে হওয়া বা  
একঘরে করা এক বিষয় নয়। বাংলাদেশের সাহিত্য, বিশেষত কবিতা বাংলাদেশের রাজনীতির  
সমান্তরালে বিকশিত। ফলে বাংলাদেশের যা কিছু মূলধারার বয়ান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, কবি-লেখক-  
শিল্পীরা তা থেকে বিচ্ছিন্ন নন। অর্থাৎ মূলধারার বয়ানকে যাঁরা সাহিত্যে ধারণ করতে পারেন, তাঁরাই  
মূলধারার সাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যান—তা সে প্রধান বা অপ্রধান যা-ই হোক। কিন্তু ‘লোক  
লোকান্তর’, ‘কালের কলস’, ‘সোনালি কাবিন’-এর আল মাহমুদকে অপ্রধান বলার সুযোগ এখন  
পর্যন্ত ঘটেনি।

তারপরও সাহিত্যের বাজারে আল মাহমুদ দীর্ঘদিন ছিলেন নিঃসঙ্গ ও একাকী। এর শেষ চিহ্ন হয়ে  
থাকে তাঁর মৃত্যুর পর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য মরদেহ না নিয়ে আসতে  
পারার ‘রাজনীতি’। আল মাহমুদের সঙ্গে মূলধারার এই বৈরিতা বোঝার জন্য তাই তাঁর কবিতা  
ছাপিয়ে গদ্যপাঠও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। যে কবি কবিতায় বলেন: ‘ফেক্রয়ারির একুশ তারিখ/ দুপুর  
বেলার অঙ্ক/ বৃষ্টি নামে, বৃষ্টি কোথায়?/ বরকতের রক্ত।’, সেই কবিই গদ্যে যখন লেখেন ‘ফেক্রয়ারি:  
সাংস্কৃতিক মান্তানির মাস’, তখন তাঁর গদ্যকে আর নিরীহ বিষয় বলা যায় না। গদ্যের ভেতর দিয়ে  
তিনি যে বাংলাদেশকে পাঠ করতে চেয়েছেন, সেই পাঠও সরলরৈখিক থাকে না; বরং তৈরি হয়  
পাঠান্তর। আল মাহমুদের গদ্যরচনাগুলোকে কতখানি প্রবন্ধ বলা যায়, তা নিয়েও কথা আছে। তাঁর  
প্রবন্ধ হিসেবে পরিচিত বেশির ভাগ গদ্য সংবাদপত্রের কলাম, সম্পাদকীয় ও সভার বক্তৃতা  
হিসেবে লিখিত ও পুনর্লিখিত। আকারেও দীর্ঘ নয়। তবে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার ফলে যে  
তাৎক্ষণিকতার সৃষ্টি হয়, তারও একটা আবেদন থাকে—চলতি সময়কে দ্রুত ধারণ করা। কাজী  
নজরুল ইসলামের প্রবন্ধ ও গদ্য রচনার মধ্যেও এই প্রবণতা দেখা যায়।

আল মাহমুদের কবিতার শরীরে যেমন, তেমনি সাহিত্যচিন্তার কেন্দ্রেও থাকে বাংলাদেশ। সেই  
বাংলাদেশ কেমন? আল মাহমুদের বাংলাদেশের পাঠ অপরাপর গদ্য-উচ্চারণের মতোই স্পষ্ট ও  
সোজা, ‘১৯৪৭ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ শাসিত ভারত বিভক্ত হয়ে গেলে বাংলার ভাটি অঞ্চলের যে

অংশের নাম হয় পূর্ব পাকিস্তান, তা অনন্তকাল ধরেই নিজেদের অ-ভারতীয় ও অনার্য জাতি বলে গর্ববোধ করে এসেছে। এই গর্ববোধই প্রথমে ভাষা আন্দোলন, পরে সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম দিয়েছে।' এই পাঠ এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের মূল বয়ানেরও পাঠ। তবে তাঁর এই পাঠে যুক্ত হয় ভারত-সাপেক্ষতার বিপরীত পাঠ। এই পাঠকে অস্বীকার করার জো নেই; যদিও কথাগুলো যখন বলেন আল মাহমুদ, তখন জাতীয়তাবাদী বয়ানের দ্রুত খানিকটা কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। 'বাংলাদেশের সাহিত্য' বা 'বাংলাদেশের কবিতা' বলে যে বর্গ এখন অনেকটাই সুচিহ্নিত, এই চিহ্নায়নের পথও ততটা মসৃণ ছিল না। সাতচল্লিশ-পরবর্তী ঢাকাকেন্দ্রিক সাহিত্যই বাংলাদেশের সাহিত্য—এই পরিচয় সব সময় একমাত্রিক ছিল না। সাতচল্লিশ-পরবর্তী রাজনৈতিক পরিবর্তন কীভাবে সাহিত্যধারাকে স্বতন্ত্র করে তোলে, তা নিরূপণের জন্য অনেকেই স্বতন্ত্র স্বরে কথা বলতে হয়েছে দীর্ঘদিন। এই স্বরে জাতিসত্তা সন্ধান, স্বাদেশিকতা, ভাষাবোধ ও জাতীয়তার চেতনার সঙ্গে কখনো যুক্ত হয়েছে মুসলমানি উপাদান। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের পরও এই স্বরের যাত্রা অব্যাহত ছিল। এবং সেই স্বর নির্মাণের অভিযাত্রায় আল মাহমুদ অগ্রগামী। তিনি কবিতার মধ্য দিয়ে তার বাস্তব ভিত্তি যেমন নির্মাণ করেছেন; কথাসাহিত্য-প্রবন্ধেও যোগ করেছেন নতুন মাত্রা।

বাংলাদেশের কবিতার ধারা সম্পর্কে তাই আল মাহমুদ স্পষ্টতই বলেন, 'এ ধারাটি কলকাতা বা বাংলাদেশ বহির্ভূত অন্য কোনো কেন্দ্রভূমির প্রাধান্যকে স্বীকার না করেই নিজেদের প্রকৃতি ও পরিবেশে থেকে রস আহরণ করে বৈচিত্র্যে পূর্ণ হয়ে ওঠার দুঃসাহসে বলীয়ান বলে আমাদের আশাকে জাগিয়ে তুলেছে' (সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা)। বাংলাদেশের কবি ও কাব্যধারার সীমাবদ্ধতার বিভিন্ন সূত্র সন্ধান করলেও তিনি বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের কবিতার প্রতিই আস্থাশীল থেকেছেন। তীব্র জাতীয়তাবাদের চেয়ে এখানে কবির স্বভূমিঘনিষ্ঠতা ও জনলগ্নতাই প্রকাশিত হয়।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতিপক্ষের কাছে—তা সে ষাটের দশকের পাকিস্তান পর্বে হোক অথবা পঁচাত্তর-পরবর্তী বাংলাদেশ পর্বে—যে রবীন্দ্রনাথ অন্যতম প্রতিপক্ষ বলে বিবেচিত হয়েছিলেন, আল মাহমুদের কাছে সেই রবীন্দ্রনাথ 'জীবনধারণের এক অর্থবহ বিশ্রাম বা আশ্রয়' (সমকালে রবীন্দ্রকাব্যের উপযোগিতা)। রবীন্দ্রনাথকে স্বীকার করে নিয়েই তাঁর কবিসত্তায় যে স্বাতন্ত্র্যের অভিযাত্রা অব্যাহত থাকে, তা প্রকাশ্য গদ্যেও (প্রবন্ধ) অস্পষ্ট থাকে না। তিনি জানান, রবীন্দ্রকাব্যেই তাঁর কবিস্বদয় 'বশীভূত' থাকে। যদিও 'বিশ্বাস' তাঁকে 'আধুনিকদের' থেকে অনেকখানি তফাত করে রাখে, অথচ রবীন্দ্রকবিতায় তিনি খোঁজেন 'বিশ্বাসে বিনয় হৃদয়'। বাংলাদেশের কবি হিসেবে আল মাহমুদ কাদের পূর্বসূরি হিসেবে মেনেছেন এবং কাদের মানেননি, সেই পাঠও জরুরি। 'জসীমউদ্দীনের অহংকার' প্রবন্ধের শুরুতেই তিনি জানান, 'কবি জসীমউদ্দীনের তিরিশ দশক ও ত্রিশোত্তর বাংলা কবিতার আঙ্গিকগত বৈচিত্র্যকে চমকপ্রদ বলে মাঝেমাঝে স্বীকার করলেও তাদের নির্বাচিত বিষয়বস্তুকে কিছুতেই আধুনিক বলে মানতেন না। এই অস্বীকৃতিই তাকে নিঃসঙ্গ করে দিয়েছিল।' এইটুকু পড়ে চট করেই মনে হয়—আল মাহমুদও কি এমনতর নৈঃসঙ্গ্যে আক্রান্ত হননি?—কবিতায় না হলেও জীবনবিশ্বাসের চিহ্নায়নে? বাংলাদেশ কবিতাপাঠের ক্ষেত্রে তিনি জসীমউদ্দীন-সংক্রান্ত কিছু বিষয়ে সদর্পে মতামত দিয়েছেন, 'তাকে (জসীমউদ্দীন) যেখানে-সেখানে "পল্লিকবি" বলে গাল পাড়লেও নাগরিক নৈঃসঙ্গ্য সহ্য করার মতো খাঁটি "আরবান" মানসিকতা তার মধ্যে ছিল বলেই পরবর্তী ত্রিশ, চল্লিশ এবং পঞ্চাশ দশকের "আরবান কবিকুলের" যুথবদ্ধ গ্রাম্য অবজ্ঞাকে তিনি পান্ডা দেননি।' এই বক্তব্যে জসীমউদ্দীনের প্রতি কেবল তাঁর 'বাংলাদেশীয়' সমর্থনই মেলে না, বরং একই সঙ্গে বাংলাদেশের কবিতার পূর্বসূরি



নির্ধারণ ও সাতচল্লিশ-পরবর্তী বাংলাদেশের কাব্যধারার দৌল্যমানতা প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের কাব্যধারায় ফররুখ আহমদ ও আল মাহমুদের পূর্বসূরি হিসেবে গৃহীত। ফররুখকে তিনি 'ন্যায়ের পথে নিঃসঙ্গ কবি' বলে গ্রহণ করেছেন। এই গ্রহণের পেছনে কেবল কবিকৃতিকেই বিবেচনায় আনেন না, বরং যে কারণে বাংলাদেশের 'প্রগতিশীল' মহলে তিনি ছিলেন সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু—ইসলামি মূল্যবোধ—তাকেও গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা-অনুষঙ্গ করেছেন। বলেছেন, 'তুলনামূলক সাহিত্যালোচনায় ফররুখকে অকবি, সাম্রাজ্যবাদের বা উপনিবেশবাদের দালাল হিসেবে চিহ্নিত করা যুক্তির দ্বারা সম্ভবপর ছিল না।' এই একই কথা ফলে যায় কয়েক দশক পরে স্বয়ং আল মাহমুদের ক্ষেত্রেও।

পঁচাত্তর-পরবর্তী বাংলাদেশ পর্বের যে জাতীয়তার ধারণা, যার নাম বাংলাদেশি জাতীয়তা, আল মাহমুদ সেই ধারণার অনুসারী। কিন্তু তিনি পঁচাত্তরের পরেই যে এর অনুসারী হয়েছেন, তা নয়। তাঁর কাব্য-অভিযাত্রায় এই পরিচয় সনামে না থাকলেও এর উপস্থিতি শুরু থেকেই ছিল। গদ্যে তা আরও প্রত্যক্ষ। এই বাংলাদেশ-ধারণার স্বরূপ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তিনি কখনো কখনো প্রতিবেশী ভারতীয় বাঙালিদের সঙ্গে তুলনা-প্রতিতুলনায় জড়িত হয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন, হিন্দি ও ইংরেজির আধিপত্যে কলকাতায় বাংলা যেখানে কোণঠাসা, সেখানে 'আমাদের (বাংলাদেশের) ভাষা স্বাধীন। আমাদের সাহিত্য স্বাধীন।' যদিও সংস্কৃতিচর্চার বিষয়ে তিনি জানান, 'এদেশীয় কয়েকজন ভারতীয় আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির বিপরীত কর্মতৎপরতায় লিপ্ত থেকে এখনো কলকাতাকেই বাঙালি সংস্কৃতির পীঠস্থান বানিয়ে রাখতে চায়।' কথাটায় আক্রমণ আছে; কিন্তু বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে এই প্রবণতার পক্ষে ও বিপক্ষে—উভয় আলাপই জারি আছে। সত্তর ও আশির দশকে বাংলাদেশের পুস্তকশিল্পে ভারতীয় আধিপত্যের বিষয়েও তিনি সবাক। জ্ঞানের রাষ্ট্রসীমা না থাকলেও বাজার হিসেবে বইয়ের রাষ্ট্রগত সমীকরণ আছে। ১৯৬৫ সালের পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের পর পশ্চিমবঙ্গনির্ভর পূর্ব পাকিস্তানের বাংলাভাষী পাঠককে বেশ বেকায়দায় পড়তে হয় ভারতীয় বাংলা বইয়ের দুর্লভতার কারণে—এটা অনেকেরই জানা। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পর সেই অর্গল খুলে যায়। কিন্তু এর কারণে বাংলাদেশি বই ব্যবসায়ীরা যে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে, সে বিষয়েও একাধিক নিবন্ধে তিনি উল্লেখ করেছেন।

বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিচিহ্নায়নে আল মাহমুদ ধর্মীয় চিন্তা, বিশ্বাস, ধর্মীয় ঐতিহ্য ও মূল্যবোধকে বাদ দেন না; বরং গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে এর পরিধিকে বাড়িয়ে নিতে সচেষ্ট থাকেন। সংস্কৃতি বলতে কী বোঝেন, তা বলতে গিয়ে তিনি লেখেন 'আমার সংস্কৃতি ও গণমাধ্যম' প্রবন্ধ। এখানে 'আমার সংস্কৃতি' মানে বাংলাদেশের সংস্কৃতি। আল মাহমুদের কাছে সংস্কৃতি গান-নাচ-নাট্যমাত্র নয়। অনেকের আলোচনায় অনুল্লিখিত থাকলেও তিনি ধর্মবোধকে সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে মনে করেন। তিনি সংস্কৃতির অপরাপর উপাদান, যেমন পোশাক, খাদ্যাভ্যাস, সামাজিক সম্পর্ক ইত্যাদির মতো ধর্মকে একক উপাদান হিসেবে বিবেচনা করেননি, বরং সব কটি উপাদানকে ধর্মীয় মূল্যবোধসাপেক্ষ করে দেখেছেন। এ বিষয়ে সবাই একমত না-ও হতে পারে; কিন্তু তিনি নিজস্ব বিশ্বাস ও কায়দায় এর দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ প্রবলভাবে দৃষ্টিগ্রাহ্য হলেও সেই দৃষ্টিকোণও বাংলাদেশেরই একটি দৃষ্টিকোণ। নিজের ভাষা, জাতিসত্তা, সাহিত্য, জাতীয়তা ইত্যাদি নিজমূলক বিষয়ের মতো ধর্মকেও তিনি নিজের বলেই মনে করেন। এখানে কোনো লুকোছাপা নেই। যে সাম্প্রদায়িকতার তির আল মাহমুদের দিকে, তিনি নিজেই কবিতার ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক বিবেচনাকে ক্ষণস্থায়ী মনে করেন। 'সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা' প্রবন্ধে কবিদের মধ্যে এই প্রবণতাকে নির্দেশ করেছেন শ্লেষাত্মক অনুষঙ্গে: 'সাম্প্রদায়িকতা ও

দলীয় মতাদর্শ কাককেও কিছুকালের জন্য কোকিল বা ময়ূরে রূপান্তর করতে পারে।' হাল আমলে ধার্মিকতা আর সাম্প্রদায়িকতা অভিন্ন হিসেবে বিবেচিত হলেও আল মাহমুদের কাছে বিচারের মাপকাঠিটি ভিন্ন। আল মাহমুদের আত্ম-আবিষ্কারের অভিযাত্রায় ধর্মের যে উপস্থিতি, সেটি নতুন বিষয় নয়। মুসলমান-অধ্যুষিত বাংলাদেশের রাজনীতি ও সাহিত্যে ধর্মীয় অনুষ্ণু বিপুলভাবে উপস্থিত থাকে চল্লিশের দশকে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রযন্ত্র তার শোষণের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ধর্মতন্ত্রকে ব্যবহার করে। ষাটের দশকে বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকশিত হওয়ার মুহূর্তে প্রতিপক্ষ হিসেবে উপস্থিত থাকে সেই শোষণশক্তি। আর তার উপজাত হিসেবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের অদৃশ্য প্রতিপক্ষে পরিণত হয় ধর্মীয় ঐতিহ্য। কিন্তু জনমানুষের নিত্যকার জীবনে ধর্মের সদর্থক উপস্থিতিও তো ছিল। বাঙালি মুসলমান বাঙালিত্বকে গ্রহণ করলেও মুসলমানিত্বকে অস্বীকার করেনি কখনো। কিন্তু মূলধারার বয়ানে মুসলমানিত্ব থেকে যায় উহ্য। আল মাহমুদ জনমানুষের মধ্য থেকে নিজের পরিচয় নির্ণয় করতে সেই উহ্য পরিচয়কে প্রকাশ্য করেছেন এবং সদর্থক অর্থে গ্রহণ করেছেন।

বিচিত্রমাত্রিক জীবন আল মাহমুদের। 'লোক লোকান্তর'-এর কবি যেমন 'গণকণ্ঠ'-এ কাজ করেছেন, স্বৈরশাসকের কবিতা আসর এশীয় কবিতা উৎসবে (১৯৮৭) ছিলেন অগ্রণী, একসময় ইসলামপন্থী দলের সভা-মাহফিলেও অংশগ্রহণ করেছেন; কিন্তু তারপরও তাঁর 'কালের কলস' বা 'সোনালি কাবিন' বুদ্ধবুদ্ধের মতো মিলিয়ে যায় না। একইভাবে দ্বিধাহীনভাবে তাঁর গদ্য-উচ্চারণও তাঁর সত্তা ও সময় পরিচিহ্নায়নের অন্যতম সারথি হয়ে থাকে। আল মাহমুদ তাঁর গদ্য ও প্রবন্ধে যা কিছুকে 'আমার' বা 'আমাদের' বলে উল্লেখ করেছেন, তা-ই বাংলাদেশের সমরূপ হিসেবে নির্দেশিত হয়েছে। এভাবেই তিনি বাংলাদেশকে সামূহিকভাবে ধারণ করতে চেয়েছেন। কিন্তু বাংলাদেশকে তিনি যেভাবে ধারণ করেন বা দেখেন, তা সম্পূর্ণত মূলধারার বয়ানের অনুগামী নয়। ফলে আল মাহমুদের দৃষ্টিতে ও সৃষ্টিতে বাংলাদেশের পাঠ কেবল পাঠের মধ্যে সীমায়িত থাকে না; জাতীয়তাবাদী হেজিমনির সাপেক্ষে পাঠান্তরভুক্ত হয়ে যায়। এই পাঠান্তরই আল মাহমুদের একলা হওয়ার অন্যতম কারণ; অন্য বিবেচনায় এটিই তাঁর অনন্যতা।

51.....

Text not found

Text not found

এই সাক্ষাৎকারটি কবি আল মাহমুদ দিয়েছিলেন তাঁর ৭৯তম জন্মদিনের আগমুহূর্তে। তখন তিনি অসুস্থ, চোখে ভালো দেখতে পান না। তবুও নিজের জীবন ও কবিতা, প্রেম-কাম-যৌনতাসহ নানা বিষয়ে কথা বলেছিলেন অকপটে। আজ আল মাহমুদের জন্মদিনে ২০১৪ সালে নেওয়া ও প্রকাশিত তাঁর এই সাক্ষাৎকারটি আবার প্রকাশ করা হলো। সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন জাফর আহমদ রাশেদ

জাফর আহমদ রাশেদ: বইপত্রে লেখা হয় আপনার জন্ম ১৯৩৬ সালে। কিন্তু আপনি একবার আমাদের বলেছিলেন আপনার জন্ম আসলে আরেকটু আগে।

আল মাহমুদ: '৩৬ সালে আমার জন্ম—এখন এটাই গ্রাহ্য আর কি। কিন্তু আমার বয়স আরেকটু বেশিই। দু-তিন বছর বেশি হতে পারে।

রাসেদ: আমরা জানি, ১১ জুলাই আপনি ৭৯-তে পা রাখছেন। প্রকৃতপক্ষে আপনি ৮০ পেরিয়ে গেছেন।

আল মাহমুদ: এই দুনিয়ায় ৮০ পার হওয়া কি সোজা কথা?

রাসেদ: যে জীবন পার হয়ে এলেন, তা নিয়ে আপনার উপলব্ধির কথা বলুন।

আল মাহমুদ: আমার তো ভালোই লাগছে। উপলব্ধির কথা যদি বলো, হ্যাঁ, উপলব্ধি আছে। দীর্ঘদিন পার হয়ে আসলাম। আমি ছিলাম ভ্রমণবিলাসী, ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসতাম। এ কারণে মনে হয়, বহু রোদ্দুর ঝরছে, কখনো তুষারপাত হচ্ছে; মনে হয় বরফের মধ্য দিয়ে হাঁটছি; হেঁটে চলেছি ফুটপাথ দিয়ে। এই দৃশ্য আমি ভুলতে পারি না। কারণ, আমি অনেক দেখেছি তো। ‘জগৎ ভ্রমিয়া দেখলাম’ বলে একটা কথা আছে না? সারা দুনিয়া আমি ঘুরে দেখেছি। পায়ে হেঁটে পার হয়েছি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বড় শহরগুলো।

রাসেদ: কোন শহরটা আপনার সবচেয়ে ভালো লেগেছে?

আল মাহমুদ: এটা বললে তো সীমাবদ্ধ করা হয়ে যাবে। তবু তুমি যখন বলছ, আমার মনে হয়-পারি, অর্থাৎ প্যারিস সবচেয়ে ভালো লেগেছে।

রাসেদ: আপনার দেখা প্রথম বড় শহর ঢাকা। ঢাকায় এলেন ১৯৫৪ সালে। তখন ঢাকা কেমন ছিল?

আল মাহমুদ: বলা হতো বায়ান্ন বাজার তিগ্নান্ন গলির গোলকধাঁধা হলো ঢাকা শহর। আমি সব সময় শহরপ্রবণ মানুষ। একটা কথা আছে না, যদি পড়ে কহর (মানে পায়ে যদি কহর পড়ে যায়) তবু ছেড়ে না শহর।

রাসেদ: শহর ছাড়লে কী হয়?

আল মাহমুদ: শহর ছাড়লে সুখ নাই। আসলে সুখ হলো শহরে। এটা উপলব্ধি করতে হবে। এটা মুখের কথার বিষয় নয়।

রাসেদ: মফস্বলে বা গ্রামে যারা থাকে, তাদের জীবনে সুখ নেই?

আল মাহমুদ: আরবানিটির বাইরে আসলে সুখ নেই। আমি ওখানে ছিলাম। সত্যিকারের সুখ নেই ওখানে। তাই ওখানে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছেও কখনো হয়নি।

রাসেদ: আপনি যখন ঢাকা শহরে আসেন, তখন প্রতিষ্ঠা পাওয়া আপনার জন্য সহজ ছিল না।

আল মাহমুদ: না, সহজ ছিল না। লড়াই করতে হয়েছে। কেউ কি কারও জন্য জায়গা ছেড়ে দেয়? দেয় না। প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছে। লেখালেখি করতে হয়েছে। সমস্ত হৃদয়-প্রাণ উজাড় করে আমি লেখার চেষ্টা করেছি। লেখাই আমাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে।

রাসেদ: আপনারা যখন লিখতে এলেন, তখন বাংলা কবিতায় তিরিশের আধুনিকতার ছায়া...

আল মাহমুদ: তোমাকে যদি আমি প্রশ্ন করি, আধুনিকতার বয়স কত? ধরে নিলাম এক শ বছর।

কিন্তু তার পরে! আধুনিকতার কী হবে? আধুনিকতা আর থাকছে না। তবে কী থাকছে? শুধু কবিতা। কবিতাই থাকবে। তাকে আর আধুনিক বলার দরকার নেই। আমরা যা চেয়েছিলাম, সাহিত্য-শিল্পে সেটা যেভাবেই হোক, কিছু এসেছে।

রাসেদ: আপনার কবিতায় কিন্তু গ্রামজীবন, লোকায়ত জীবন—এগুলো আছে।

আল মাহমুদ: গ্রামজীবন ঠিক নাই, তবে লোকজ উপাদান আছে।

রাসেদ: আপনার সমসাময়িক লেখকেরা এটাকে কীভাবে নিয়েছিলেন?

আল মাহমুদ: তারা মোটামুটি গ্রহণ করেছিল। এটা গ্রাহ্য হয়েছিল।

রাসেদ: কেউ কেউ আপনাকে গ্রাম্য বা গোঁয়ো বলে তচ্ছিল্য করেছেন।

আল মাহমুদ: এরা যা চেয়েছিল তা তো তারা অর্জন করতে পারেনি। বরং আমি যেটা বলেছি, তার

কিছু-না-কিছু সত্য প্রতিভাত হয়েছে।

রশেদ: আপনার কবিতা-গল্পে একটা বড় বিষয় ছিল নারী ও প্রেম। প্রেম ও নারী নিয়ে আপনার অনুভবের কথা বলুন।

আল মাহমুদ: আমার কবিতায়-সাহিত্যে একটা নারীভাবনা আছে। নারী বলতে কিন্তু আমি রক্ত-মাংসের নারী বোঝাচ্ছি। নারী নাকি দশ হাত শাড়িতে ঢাকা পড়ে না। নারী বলতে আমি কামনা-বাসনা-যৌনতা—এসব মিলিয়েই বুঝিয়েছি। আমি ঠিক বোঝাতে পারছি না।

রশেদ: ‘যেভাবে বেড়ে উঠি’ আপনার আত্মজৈবনিক উপন্যাস। এই বইয়ের নারী চরিত্রগুলো খুব আকর্ষণ করে। এই বইয়ের নারী চরিত্রগুলো নিয়ে বলুন।

আল মাহমুদ: অনেক দিনের কথা তো। হ্যাঁ, এদের জন্য আমার মধ্যে একটা কাতরতা আছে।

রশেদ: শোভার কথা মনে আছে, যে আগরতলা চলে গেল? বিশিদির কথা?

আল মাহমুদ: দেখতে তো সুন্দর ছিল না শোভা, কিন্তু স্বাস্থ্য ভালো ছিল। খুব আকর্ষণীয় ছিল। বই লেনদেনের মাধ্যমে পরিচয়। বই দিয়ে সই। আর বিশিদির সঙ্গে সম্পর্কের কথা বলছ? সত্যি কথা বলতে কি, সে তো আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল। আমি তাকে জোর করে ধাক্কা মেরে পালিয়ে এসেছিলাম।

রশেদ: কেন?

আল মাহমুদ: কারণ, সে যেটা চায়, আমার কেন যেন মনে হয়েছিল, ঠিক না এটা।

রশেদ: পরে কখনো আপনার মনে হয়েছে যে পালিয়ে আসা ঠিক হয়নি?

আল মাহমুদ: এটা তো তুমি খুব খারাপ কথা বললে।

রশেদ: ওই উপন্যাসে যেসব কথা বলেননি বা বলতে পারেননি, তার দু - একটা আমাদের বলুন।

আল মাহমুদ: কামের বাসনা যেটা, তার কথা তো আমি কোনো লজ্জা - শরম না রেখেই সাহিত্যে বলেছি। কামের প্রাবল্য মানুষকে মনুষ্যত্ব দেয়। কামবাসনা থাকতে হবে। সোজাসুজি বললে, এটা হলো যুক্ত হওয়ার বাসনা।

রশেদ: ফেসবুকে আপনার একটা লেখা পড়েছি। সেখানে আপনি লিখেছেন, ‘নিজের কাঠগড়ায় নিজেকে দাঁড় করিয়ে বিচার করতে গেলে আমাকে কিছুতেই আমি একজন ভালো লোক বলে মনে করতে পারি না।’ কেন?

আল মাহমুদ: নিজে যখন নিজের মধ্যে অন্ধকারটা দেখি, তখন কী করে বলব আমি ভালো মানুষ?

রশেদ: সেই অন্ধকারটা কী?

আল মাহমুদ: সে তো অনেক বিষয়। সন্ধ্যা - ভোরে আলোর বিনয়, সবাই মিলে গান ধরেছে, প্রেমের মতো আর কিছু নয়।

রশেদ: আরেকটু পরিষ্কার করুন।

আল মাহমুদ: আমার মধ্যে কামনা-বাসনা আছে। শারীরিক মিলনের আকাঙ্ক্ষা আছে। আমি তো আর ধোয়া তুলসীপাতা না। আসলে মানুষের যে কামনা, সোজা কথায় যে যৌন-আকাঙ্ক্ষা, সেটা যদি না থাকত, তাহলে জীবনটা হতো লবণ ছাড়া পান্ডার মতো।

রশেদ: পৃথিবী বদলে যায়। বিশ্বাসও বদলায়। আপনার বিশ্বাস কি বদলেছে?

আল মাহমুদ: না, যেকোনো কারণেই হোক, আমার বিশ্বাস বদলায়নি। আমার ভেতরে যে বিশ্বাস ছিল, তার ওপর আমি অনেক পড়াশোনা করেছি। মার্ক্সবাদ নিয়েও পড়াশোনা করেছি। কিন্তু আমার ভেতর থেকে একজন আমাকে সব সময়ই বলত, প্রে, মানে প্রার্থনা করো।

রশেদ: আপনার ‘জেলগেটে দেখা’ কবিতার দুটো লাইন শোনাই, ‘আমি কতবার তোমাকে বলেছি,

দেখো/ মুষ্টিভিক্ষায় দারিদ্র্য দূর হয় না।/ এর অন্য ব্যবস্থা দরকার, দরকার সামাজিক ন্যায়ের।’  
আপনি কি কোনো বিশেষ ব্যবস্থার কথা বলছেন?

আল মাহমুদ: মুষ্টিভিক্ষায় দারিদ্র্য দূর হয় না। সামাজিক ন্যায়ের দরকার। এখানে তো বোঝাই যাচ্ছে।

রাশেদ: ‘সামাজিক ন্যায়’ বলতে কী বুঝাব? ‘আমাদের ধর্ম হোক সম্পদের সুষম বণ্টন’?

আল মাহমুদ: কথাটা আসলে ঠিকই বলেছ। সম্পদের সুষম বণ্টন লাগবে। আমার তা-ই মনে হয়।

রাশেদ: ১১ তারিখ আপনার জন্মদিন। জন্মদিন উপলক্ষে মৃত্যু বিষয়ে একটু কথা বলি। আপনার সাম্প্রতিক কালের কবিতায় মৃত্যু নিয়ে কিছু কথাবার্তা দেখতে পাচ্ছি।

আল মাহমুদ: দীর্ঘশ্বাস ফেলে মৃত্যুর চিন্তা করব, এ ব্যাপারটা আমার নেই। আমার কবিতায় আমি মৃত্যুর বর্ণনা দিয়েছি। কেউ কি মৃত্যু থেকে ফিরে আসছে? তো মৃত্যু কী, সেটা কীভাবে বলা যায়?

মৃত্যু, সমাপ্তি-এসব বিষয় আমি কেয়ার করি না। এসব নিয়ে আমি একেবারেই উদ্বিগ্ন নই।

রাশেদ: আপনার একটা গল্প আছে ‘জলবেশ্যা’। গল্পটার মূল বিষয় নিয়ে ‘তরঙ্গিত প্রলোভন’ নামে একটা কবিতাও আছে ‘সোনালী কাবিন’-এ। এই কবিতা ও গল্পের অভিজ্ঞতা আপনার কোথায় হয়েছিল?

আল মাহমুদ: আমাদের গ্রামের ওই দিকে লালপুর নামে একটা জায়গা আছে। লালপুর বাজারে আমি এই দৃশ্য দেখেছি।

রাশেদ: ‘বখতিয়ারের ঘোড়া’ কবিতাটা শোনাই। শুনে কবিতাটা নিয়ে কিছু বলুন।

আল মাহমুদ: এটা তো আমার ধারণা, ভালো কবিতা। খুবই ভালো লেখা। কবিতাটা যখন লিখছিলাম, তখন হৃদয় উজাড় করে লিখেছিলাম। শোনাও। [‘বখতিয়ারের ঘোড়া’ শুনতে শুনতে আল মাহমুদ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। তাঁর চোখ মুছে দেওয়া হলো। তারপর তিনি বললেন] দ্যাখো কবিতা কী করতে পারে। কবিতার সংক্রাম থেকে মানুষ আত্মরক্ষা করতে পারে না। আসলে আজকে আমি অনেক আবেগাকুল হয়ে আছি।

রাশেদ: এখন আপনি আছেন কেমন?

আল মাহমুদ: ততটা ভালো না। বয়স হয়ে গেছে তো। বয়সের একটা ভার আছে।

রাশেদ: আপনি তো এখনো গল্প-উপন্যাস-কবিতা—সবই লেখেন। কিন্তু নিজের হাতে তো লিখতে পারেন না। যখন লিখতে ইচ্ছে করে তখন কী করেন।

আল মাহমুদ: কেউ-না-কেউ থাকে। আমি বলি, ওরা লিখে নেয়।

52.....

বৃষ্টি, সরল অঙ্কের মতো

লেখা: এমরান কবির

আপনার এ কেমন ঢেউ

রোদে রোদে লীন!

ছায়ার ভেতরে আমি

তাকিয়ে বৃষ্টিহীন—

আসেন না একটু

এই নরকে বৃষ্টির ফোঁটায়  
দূরের মেঘে তাকিয়ে তাকিয়ে তবুও  
অধ্যাপিকা হেঁটে যায়  
অধ্যাপিকা,  
আপনি তো খুউব  
সরল অঙ্কের মতো  
বৃষ্টিবাহিকা!

53.....

আইক্লাউড, মিনতি গ্রহণ করো  
জাহিদ হায়দার জাহিদ হায়দার

দাঁড়াও মেঘবর, একবার দাঁড়াও।  
প্রহর অস্থির।  
এ কাল শোনে না সামগান।  
তোমার সাদাকালো পৃষ্ঠায় রেখেছি কবিতা।  
পড়ে

শস্যধ্বনি, প্রেম, মানুষের ভাঙনপ্রথা,  
নদী ও বালির শব্দবিবাহ,  
আর অযথা বিধান।

গুলবাগে রজনীগন্ধা মৃত, করি বাস।  
গলিপথ সকল ঘড়িতে ঘুমহীন:  
ঝগড়া জীবিত। আছে প্রাণ। কাঁদে ক্ষুধা।  
নৈঃশব্দ্য বলে কিছু নেই। আবর্জনা চিরসঙ্গী।

আমাকে জটিলতা সহজে পোষে।  
কথা ছিল, দেখা হবে হাতিরঝিলে।  
রূপনগরে প্রিয়তমা আরশিতে সমাচার।  
তাকে বেঁধেছিল অরূপ শেকল।  
বাড়ে বিল উষ্ণ মোবাইলে।  
ঝরে পড়ে তার জানলায়,  
করো তৃষ্ণাহীন যা কিছু আছে অদ্ভুত।  
জলবায়ু আগুনসখা আমাদের দোষে।  
তুমি নও শুধু পূর্ব ও উত্তরমেঘ।  
এ নগরে উজ্জয়িনী নেই,  
নেই দেবগিরি।  
যুবতী পড়েনি মেঘদূত।

54.....

বিসর্জন

মনোজ দে

রাত্রির বুকে মাথা ঠুকে ঠিকই  
আমি ঘুমাব  
পৃথিবীর শেষ আশ্রয়ে  
সারা রাত বৃষ্টির জলে ভিজে  
পরান আজ এক কাদামাটি  
আমাকে মূর্তির মতো গড়ে নেবে?  
নিতেই পারো, তোমাদের যা ইচ্ছে কিছু  
চক্ষুদানের রং-তুলিটাও যত্নে সাজিয়ে রেখেছি  
একদিন অকালবোধন শেষে  
বিসর্জনের নৌকাটা ঠিকঠাক সাজিয়ে রেখো।

55.....

সারদা চলে গেলে

ওমর কায়সার

বহু গুহাপথ পার হয়ে  
আমাদের ট্রেন  
গুয়াহাটীর ভোরে এসে থামে।  
তুমি নেমে গেলে  
পাথরের গায়ে ফুটে থাকা  
অতি ক্ষুদ্র নাকফুলের আদর ছিটিয়ে।  
আর উপত্যকার পাশে তিস্তা নদী  
পাথরে মাথা খুটে খুটে  
অবিরাম বিলাপের সুরে  
গড়িয়ে গড়িয়ে  
কোথাও বরফ হয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল।  
দার্জিলিংয়ের পাখিমেঘ  
এমন শীতল দুঃখে ওম দিয়ে চলে গেছে  
টাইগার হিলে অনন্ত সূর্যোদয়ের অপেক্ষার কাছে।  
লাচুংয়ের পর্বতশীর্ষে বরফকুচিতে  
ফুটে আছে সারদার মন।

এ পাহাড় যত দূর যায়  
সঙ্গে থাকে সারদাকুণ্ড রায়।